BDeBooks.com

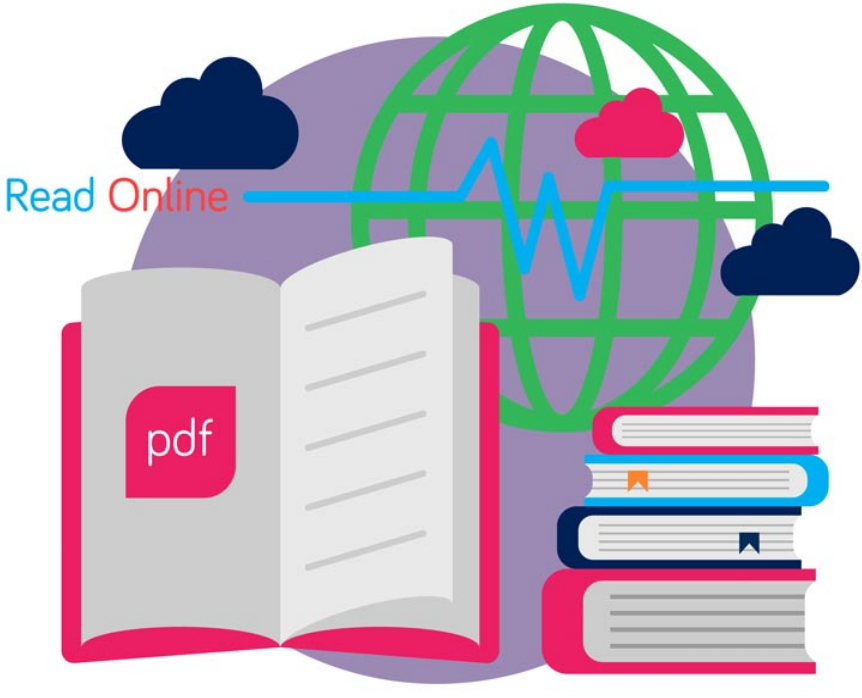

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

মহাকাশের দূত

২২শে অক্টোবর

ব্রেন্টউড, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু,

মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনও প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনও একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনও একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে; নিয়মমতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরও আট বছর। সেখানে মাত্র দু' বছর লাগল কেন? তা হলে কি এই প্রাণী বেতারতরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে? এরা কি তা হলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত?

যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভাল আছ। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস

ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফীল্ডিং হল আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কি না, বহু চেষ্টায় তার কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফীল্ডিং তখনও একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের রিসিভার তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেন্টিমিটারে বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

প্রাচীন মিশরের একটানা সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে অনেক রাজার উল্লেখ আছে এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য কফিনবদ্ধ শবদেহের সঙ্গে ধনরত্ন পুঁথিপত্র

পোশাকপরিচ্ছদ বাসনকোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুরে দেওয়া হত সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সিলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে হইচই পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায় কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে সেই দিনই সকালে স্থানীয় পুলিশ দুটি চোর ধরেছে, যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তারা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পুব পারে বেনি হাসানে একটি চুনা পাথরের টিলার গায়ে লুকোনো ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশরসরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হল একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরাজিতে বলে ওর‍্যাক্‌ল্‌স। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নস্ট্রাডামুসের ওর‍্যাক্‌ল্‌সের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্য ভাবে ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসি বিপ্লবে ষোড়শ লুই-এর গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন হিটলারের উত্থান পতন, এমনকী হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নস্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। হয়তো যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন এইসব ভবিষ্যদ্বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান আকাশযান টেলিফোন টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছে; কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রারেড রে আল্‌ট্রা ভায়োলেট-রে'র কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে—এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিকমহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে—সেটা হল এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগৎ আছে যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিনগ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলেকয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লন্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে

পৃথিবীর কয়েকজন বাছাইকরা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডা. এডওয়ার্ড থর্নিক্রফ্‌ট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়তো সেখানে লেখকের নাম ছিল; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে সে যে কতবার 'হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ' ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই।

বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধ হয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করে। আমিও দেখলাম প্যাপাইরাসটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ফীল্ডিং যে গ্রহ থেকে তার বেতার সংকেতের উত্তর পেয়েছে, প্যাপাইরাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে?

ব্যাপারটা আরও কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল; কেন তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে সেটা হল এই—

কায়রোতে পৌঁছানোর দুদিন পরেই সে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভাল হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে এহেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলেন যে হাঁপানির জন্য তিনি বন্ধ ঘরে শুতে পারেন না।

দুদিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনও জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার কী দিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। ভদ্রলোকের স্যুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন—'নেখবেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।'

মিশরীয়রা সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানারকম জন্তু জানোয়ার পাখি সরীসৃপকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করে এসেছে। শেয়াল কুকুর সিংহ প্যাঁচা সাপ বাজপাখি বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে নেখবেৎ দেবী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় মর্গেনস্টার্ন ভোররাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভাল রকম বকশিশ দিয়ে। পুলিশ প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনও ক্লু পাওয়া যায় কি না। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারী অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তাঁর গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডে হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনা রোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের

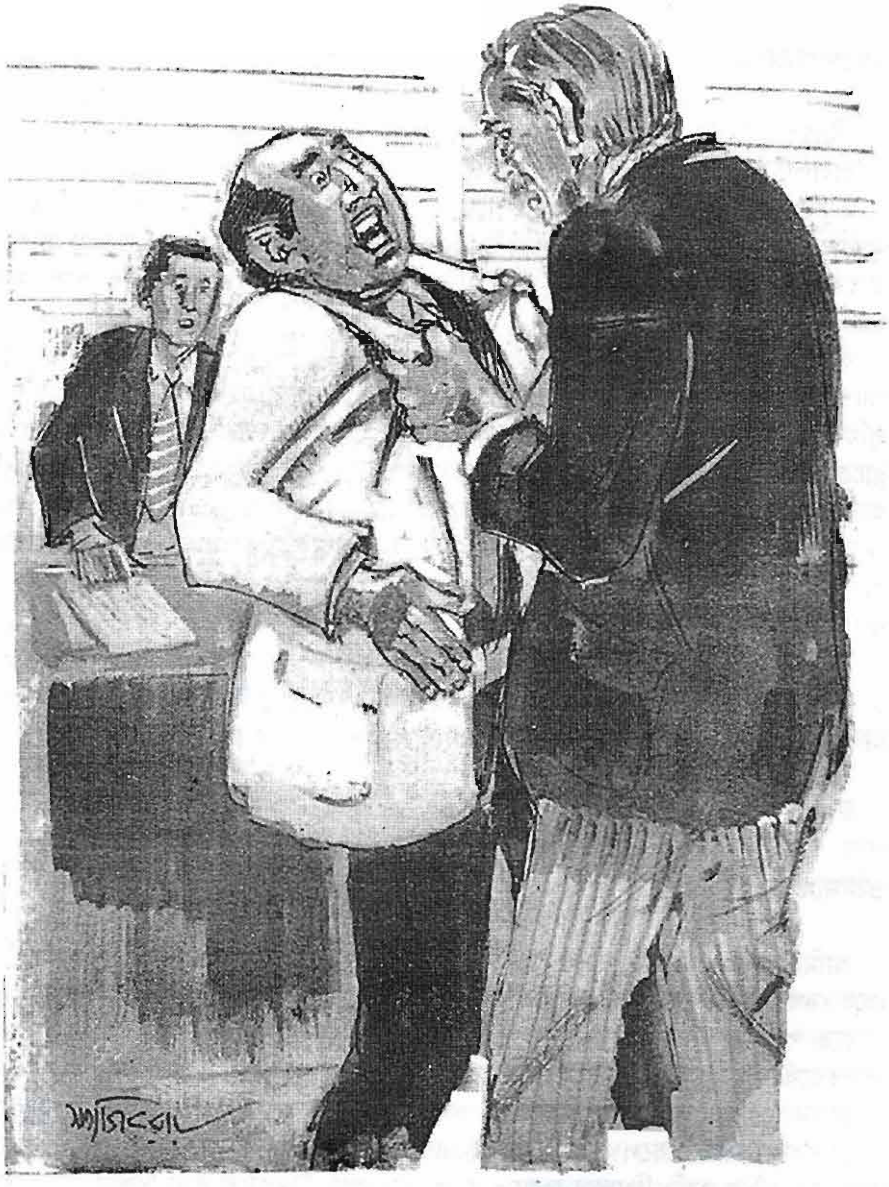

মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরও আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃত্যুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে। ডেক্সটার একজন তরুণ ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছরতিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে; আমার চিঠিতেই ভারতসরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি

দেয়। ও বলে রেখেছে এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমতো স্পষ্ট, এবং তা শুধু মৌলিক সংখ্যায় নয়।

ফীল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফীল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপশোস হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমার বাগানে ডেকচেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি; কাল দেড় ঘণ্টায় সতেরোটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরি টেলিগ্রাম—'পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো—তোমার জন্য হোটেল কার্ণাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে।' আমি জানিয়ে দিয়েছি ৩রা নভেম্বর পৌঁছোচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমিই কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘণ্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ারপোর্টে এসে দেখব শুধু ফীল্ডিং নয়, ক্রোলও এসেছে; কিন্তু সেইসঙ্গে যে আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার ওপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রং আগে কখনও দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সোজা লন্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল, অভিশাপ টভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনও ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল?' ব্রায়ান বলল, 'অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তা ছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়লোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনও কীর্তি রেখে যেতে। হয়তো

মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।'

আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফীল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কার্ণাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হল। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশবিদেশের বিচিত্র লোকের ভিড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড় খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'দেখো তো জিনিসটা তোমার চেনা কি না।'

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ!

'জিনিসটা পাওয়ামাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম,' বলল ব্রায়ান।—'তুমি যে প্যাপাইরাসটা লন্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনও তফাত দেখছ কি?'

দেখছি বই কী।—ছবিটা হাতে নিতেই তো তফাতটা লক্ষ করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিজ্ঞেস করাতে সে ব্যাপারটা বলল।—

'আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চার কোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যান্ডল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।

'ও প্রথমেই যায় থর্নিক্রফ্‌টের কাছে। থর্নিক্রফ্‌ট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর মি. এব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।'

'ওয়েল, শঙ্কু?'

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই লক্ষ করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভালভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, 'এই অংশতে তো দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে—মেনেফু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।'

ফীল্ডিং বলল, 'সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা তো আর দুদিন পরেই, আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসাব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পর যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তা হলে আজ থেকে ঠিক পাঁচহাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল—অর্থাৎ ৩০২২ বি সি-তে।'

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, 'আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে দৈবজ্ঞের যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আকাশে

ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ঈজিপ্টে মেনিসের রাজত্বকাল, আর সেটাকেই বলা হয় ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু!'

ডেক্সটার বলল, 'কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? এক-আধ বছরও কি এদিক ওদিক হতে পারে না?'

ফীল্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, এতে কোনও ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হল এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।'

'তার মানে মরুভূমিতে?' ডেক্সটার প্রশ্ন করল।

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'টেলিগ্রাফের ভাষা', বলল ফীল্ডিং, 'মর্স।'

'তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর?'

'সেটা আর আশ্চর্য কী, শঙ্কু। ভুলে যেও না তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।'

'তা হলে তো তারা ইংরেজিও জানতে পারে।'

'কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কি না সেটা হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।'

'তা হলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।—'তারা তো আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না!'

ফীল্ডিং হেসে বলল, 'না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি—এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনও অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা তো তুমি দেখেছ।'

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি—যেন একটি ছোটখাটো চলন্ত হোটেল। সেইসঙ্গে মজবুতও বটে। 'অটোমোটেল' নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

'ডা. থর্নিক্রফ্‌টও আসছেন কাল সকালে,' বলল ফীল্ডিং, 'তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।'

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থর্নিক্রফ্‌টের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক তিনিই তো প্যাপাইরাসের পাঠোদ্ধার করেছেন।

'তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ তো?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এই ধরনের অভিযানে সেটা সব সময়ই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এই আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড় এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবসুদ্ধ বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিনগ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী?

আমরা চার জনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রইলাম যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি হোটেলের ম্যানেজার

মি. নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি যে এই কার্ণাক হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন, এবং এই মি. নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

'আর কোনও শকুনটকুনি এসে কোনও ঘরের জানলায় বসছে না তো?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ঈজিপ্সীয়দের থাকলে অবশ্যই মি. নাহুম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই—আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনওদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল কুকুর যে এক আধটা দেখা যাবে না তার ভরসা দিতে পারছি না, হে হে।'

আমরা ঠিক করেছি কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দেব। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ঈজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন এক অজ্ঞাত সৌরজগতের প্রাণী? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনও তার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে নাইলের ধারে একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যাসটা আমার বহুকালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিক ভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার পাওয়া বেগুনি কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার—তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল!

'কী ব্যাপার?'

'এ স্নেক—এ স্নেক ইন মাই রুম!'

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধপ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দুজন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা করা কার্পেট বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এমাথা থেকে ওমাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

সুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে ছুট দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাত শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখুরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝেয় কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখুরোর মতো অত মারাত্মক না হলেও, বিষধর তো বটেই। প্রাচীন যুগে এই সাপকেও মিশরীয়রা পুজো করত দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগদেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

ডেক্সটার এখনও কাবু। মেনেফ্রুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি এই গোখুরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে, তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদকে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হল না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনও সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হত বলে সেটা আর হল না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্টের প্লেন এসে পৌঁছাবে ভোর ছটায়, সুতরাং তার হোটেলে পৌঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনও আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থর্নিক্রফ্ট এসে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি আঘাত পেয়ে থর্নিক্রফ্ট সংজ্ঞা হারান। দুজন সুইস টুরিস্ট পুলিশের সাহায্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহাজানি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড সমেত থর্নিক্রফ্টের ওয়লেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থর্নিক্রফ্টকে হয়তো দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন ওঁর যে কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'জানি তোমাদের যুক্তিবাদী মন এসব মানতে চায় না, আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তা হলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।'

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনেরো আগে মি. নাহুম একটি আজব জিনিস এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট ডায়েরি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে লেখা যা ছিল তা সব ধুয়ে মুছে গেছে; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না; সেটা হল ডায়েরির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেমক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফোটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লন্ডনের সেই সভায় এনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিশ এই ডায়েরিটা উদ্ধার করেছে। জেলের একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়েরিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফীল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল্ ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থর্নিক্রফ্ট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে মতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফোটো লেন্স। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে 'আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট' বা 'অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু' নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রোলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, 'এইসব লোকের তোলা বহু ছবি পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে এতেই যে, সব ছবিতেই উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখানো হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে?'

ফীল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, 'ধরো যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয়?'

'তা হলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুড়ে ফেলে দেব', বলল ক্রোল, 'চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।'

একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না।

'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে? পাঁচ হাজার বছর আগে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে তো দেখেইছি। আরও পাঁচ হাজার পিছোলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরও পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শি ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেইসঙ্গে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে।...পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়ছে সেটা আশ্চর্য নয় কি?'

আমার কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বলল,'হয়তো এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে—একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।'

'তা তো থাকতেই পারে,' বলল ফীল্ডিং।—'এরা যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কী চাই, তা হলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনও কিছুর দরকার আছে কি?'

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।
আজ অমাবস্যা।
বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছ'টা

বিজ্ঞানের সব শাখা প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনও একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কী, ফীল্ডিং, ক্রোল, থর্নিক্রফ্‌ট, ডেক্সটার, আমি—এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনও তারতম্য ধরা পড়ছে না। মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাত আছে কি?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পর পর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিটদশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের অটোমোটেলের ভিতরটা কীরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দুদিকে দুটো করে বাঙ্ক—আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দুদিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থর্নিক্রফ্‌ট, আরেকটায় ফীল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনও আলো রয়েছে। পথের দুধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চূনা পাথরের টিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মি. নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ খচ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে—যেন তিনি কোনও একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থর্নিক্রফ্‌টের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে, আর ফীল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাচে কোনও তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোখুরো। এর জাত কালকের গোখুরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এঁর নাম স্পিটিং কোবরা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুথু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফীল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর

সাপবাবাজি মরেছেন থর্নিক্রফ্‌টের সঙ্গে হাতিয়ার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফীল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হল। বিষের ছিটে চশমার কাচের তলা দিয়ে বাঁ চোখের কোলে লেগেছিল, সেখানে আমার মিরাকিউরল অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অফিশাপ টভিশাপ নয়; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে, সে নিশ্চয়ই কায়রো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরও একশো কিলোমিটার। ম্যাপে তারপরে আর কোনও রাস্তার ইঙ্গিত নেই, তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিটদশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটি বছর পনেরোর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে, তার পিছনে একপাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাতদুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

'এস্‌টাপ্‌, এস্‌টাপ্‌, সাহিব! এস্‌টাপ!'

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল, কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি থামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে।

'পিরমিট, সাহিব, পিরমিট!'

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায়?

জিজ্ঞেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

'ওগুলো তো পাহাড়—চুনোপাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায়?'

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

'তার মানে ওগুলোর পিছনে?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল—হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফীল্ডিং বলল, 'আস্ক হিম হাউ ফার।'

জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি আবার বলল, টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু' কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

'হিয়ার'—থর্নিক্রফ্‌ট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল—এবার তুমি প্রস্থান করো।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরমিট পিরমিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল

সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনও কোনও চোখে পড়েনি। আমি জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিটতিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূর বা কত বড় তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই বটে।

ঈজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভুঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠাটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তা হলে তার সময় আছে এখনও প্রায় আট ঘণ্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো তো দেখা যাবেই, কাজেই কোনও চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়োখেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শ'খানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধিসৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোট। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরও খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনও ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতিফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফীল্ডিং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'কিপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।'

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফীল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরের একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনও শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

'ওয়ান—থ্রি—সেভেন্—ইলেভেন্—সেভ্নটিন—টোয়েন্টি থ্রি...'

ফীল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র—স্পেসশিপের ভিতরে আলো

জ্বলে উঠেছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

'ফর্টি ওয়ান—ফর্টি সেভ্‌ন—ফিফ্‌টি থ্রি—ফিফ্‌টি নাইন...'

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হল।—

'পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।'

ফীল্ডিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনও ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরিজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।

'তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণপোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনও স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান—পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।

'এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণীভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তা হলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না।'

'আছে।'—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

'করো প্রশ্ন।'

'তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কি না সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে,' বলল ক্রোল।—'তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তা হলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনও বাধা নেই নিশ্চয়ই।'

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল—

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'—ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

'কারণ এই মহাকাশযানে কোনও প্রাণী নেই।'

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

'প্রাণী নেই?' ফীল্ডিং প্রশ্ন করল, 'তার মানে কি—?'

'কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ংকর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র—যার মধ্যে একটি হল এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্বপরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান।'

এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?'

'বলছি শোনো,' উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে।—'তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক—ইচ্ছা মতো আবহাওয়া বদলানো—যাতে খরা বা বন্যা কোনওটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই—শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়। তিন—বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায়; এবং চার—সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুকনো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না।...এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।'

'সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?' প্রশ্ন করল ফীল্ডিং।

'হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই ক' বছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?'

'হয়েছি বই কী!' বলে উঠল ক্রোল। 'গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড় নয়।'

'বেশ। এবার লক্ষ করো, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।'

দেখলাম, জমি থেকে মিটারখানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল—

'মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে কোনও একজন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তা হলে—'

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ কথার মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তিরবেগে মহাকাশযানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পরমুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হল।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সংবিৎ ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জিপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

'কাম অ্যালং!'—চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন দিকে গেল জিপ? রাস্তায় গিয়ে তো উঠতেই হবে তাকে।

শেষপর্যন্ত একটা কানফাটা সংঘর্ষের শব্দ, ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জিপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জিপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জিপের দফা শেষ। সেটা উলটে কাত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরের মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দুজন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন—থর্নিক্রফ্‌টের টর্চের আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন মার্কিন ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্ণাক হোটেলের ম্যানেজার নাহুমের সঙ্গে এনার ষড়যন্ত্র ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থান্বেষণের পথে যাতে কোনও বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনও দেবতার অভিশাপে নয়; তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

'লোকটার পকেটে ওটা কী?'

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফ্রুর প্যাপাইরাসের ছেঁড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফীল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস?

ফীল্ডিং তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়োআঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে তো আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু' সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরও সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনও এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৬

নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো

১৩ই জুন

আজ সকালের ঘটনাটা আমার কাজের রুটিন একেবারে তছনছ করে দিল। কাজটা অবিশ্যি আর কিছুই না : আমার যাবতীয় আবিষ্কার বা ইনভেশনগুলো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম সুইডেনের বিখ্যাত 'কসমস' পত্রিকার জন্য। এ কাজটা এর আগে কখনও করিনি, যদিও নানান দেশের নানা পত্রিকা থেকে অনুরোধ এসেছে অনেকবার। সময়ের অভাবে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ইদানীং আমার গবেষণার কাজ ইচ্ছে করেই অনেক কমিয়ে দিয়েছি। এটা ক্রমেই বুঝতে পারছি যে, গিরিডির মতো জায়গায় বসে আমার গবেষণাগারের সামান্য উপকরণ নিয়ে আজকের যুগে শুধু যে আর বিশেষ কিছু করা যায় না তা নয়, করার প্রয়োজনও নেই। দেশে বিদেশে বহু তরুণ বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য সব আধুনিক যন্ত্রপাতি হাতে পেয়ে, এবং সেই সঙ্গে নানান বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

অবিশ্যি আমি নিজে সামান্য ব্যয়ে সামান্য মালমশলা নিয়ে যা করেছি তার স্বীকৃতি দিতে বৈজ্ঞানিক মহল কার্পণ্য করেনি। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই আবার এমন লোকও আছে, যারা আমাকে বৈজ্ঞানিক বলে মানতেই চায়নি। তাদের ধারণা, আমি একজন জাদুকর বা প্রেতসিদ্ধ গোছের কিছু ; বৈজ্ঞানিকের চোখে ধুলো দেবার নানারকম মন্ত্রতন্ত্র আমার জানা আছে, আর তার জোরেই আমার প্রতিষ্ঠা। আমি অবশ্য এটা নিয়ে কোনও দিনই নিজেকে উত্তেজিত হতে দিইনি। আমার মধ্যে যে একটা ঋষিসুলভ স্থৈর্য ও সংযম আছে, সেটা আমি জানি। এক কথায় আমি মাথাঠাণ্ডা মানুষ। পশ্চিমে এমন অনেক জ্ঞানীগুণী গবেষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাঁরা কথায় কথায় টেবিল চাপড়ান, বা টেবিলের অভাবে নিজেদের হাঁটু। জার্মানির এক জীব রাসায়নিক ডঃ হেলব্রোনার একবার তাঁর এক নতুন আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে আমার কাঁধে এমন এক চপেটাঘাত করেছিলেন যে, যন্ত্রণায় আমাকে আর্তনাদ করে উঠতে হয়েছিল।

যাই হোক, এই প্রবন্ধে একটা জিনিস বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাচ্ছি ; সেটা হল—আমার আবিষ্কারগুলো কেন আমি সারা পৃথিবীর ব্যবহারার্থে ছড়িয়ে দিইনি। তার কারণ আর কিছুই না—আমার তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী বা হিতসাধক—যেমন অ্যানাইহিলিন পিস্তল বা মিরাকিউরল ওষুধ বা অমনিস্কোপ বা মাইক্রোসোনোগ্রাফ, বা স্মৃতি উদ্দীপক যন্ত্র রিমেমব্রেন—এর কোনওটাই কারখানায় তৈরি করা যায় না। এগুলো সবই মানুষের হাতের কাজ, এবং সে মানুষও একটি বই আর দ্বিতীয় নেই। তিনি হলেন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

আজ ভোরে যথারীতি উশ্রীর ধারে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে কফি খেয়ে, আমার লেখাপড়ার ঘরে বসে আমার পঞ্চাশ বছর ব্যবহার করা 'ওয়াট্যারম্যান' ফাউনটেন পেনটাতে কালি ভরে লেখা শুরু করতে যাব, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল, একজন ভদ্রলোক আমার

সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'কোন দেশীয় ?' প্রশ্ন করলাম আমি। স্বাভাবিক প্রশ্ন, কারণ পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে, যেখানকার গুণী জ্ঞানীর কেউ না কেউ কোনও দিন না কোনও দিন এই গিরিডিতে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেননি। তিন সপ্তাহ আগে লিথুয়ানিয়া থেকে এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পতঙ্গবিজ্ঞানী প্রোফেসর জাবলনস্কিস।

'তা তো জিজ্ঞেস করিনি,' বলল প্রহ্লাদ, 'তবে ধুতি দেখলাম, আর খদ্দরের পাঞ্জাবি, আর কথা তো বললেন বাংলাতেই।'

'কী বললেন ?' কথাটা অপ্রীতিকর শোনালেও স্বীকার করতেই হবে যে, মামুলি লোকের সঙ্গে মামুলি খেজুরে আলাপের সময় নেই আমার।

'বললেন কী, তোমার বাবুকে বলো, কিসমিসের জন্য লেখাটা একটু বন্ধ করে যদি দশ মিনিট সময় দেন। কী যেন বলার আছে।'

কিসমিস ? তার মানে কি কসমস ? কিন্তু তা কী করে হয় ? আমি যে কসমস পত্রিকার জন্য লিখছি, সে কথা তো এখানে কেউ জানে না !

উঠে পড়লাম লেখা ছেড়ে। কিসমিস রহস্য ভেদ না করে শান্তি নেই।

বসবার ঘরে ঢুকে যাঁকে দু' হাতের মুঠোয় ধুতির কোঁচা ধরে সোফার এক পাশে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম, তেমন নিরীহ মানুষ আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যদিও প্রথম চাহনির পর দ্বিতীয়তে লক্ষ করা যায় এঁর চোখের মণির বিশেষত্বটা : এঁর মধ্যে যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তার সবটুকুই যেন ওই মণিতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

'নমস্কার তিলুবাবু।' কোঁচার ডগা সমেত হাত দুটো মুঠো অবস্থায় চলে এল ভদ্রলোকের থুতনির কাছে,—'কসমসের লেখাটা বন্ধ করলাম বলে মার্জনা চাইছি। আপনার সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলার প্রবল বাসনা নিয়ে এসেছি আমি। আমি জানি, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

শুধু কসমস নয়, তিলু নামটা ব্যবহার করাটাও একটা প্রচণ্ড বিস্ময় উদ্রেককারী ব্যাপার। ষাট বছর আগে আমার বাবা শেষ আমায় ডেকেছেন ওই নামে। তার পরে ডাকনামটার আর কোনও প্রয়োজন হয়নি।

'অধমের নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।'

আমার বিস্ময় কাটেনি, তাই ভদ্রলোকই কথা বলে চলেছেন।

'মাকড়দায় থাকি ; ক' দিন থেকেই আপনাকে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। অবিশ্যি সে দেখা আর এ দেখা এক জিনিস নয়।'

'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন মানে ?' আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম।

'এটা মাস দেড়েক হল আরম্ভ হয়েছে। অন্য জায়গার লোক, অন্য জায়গার ঘটনা, এই সব হঠাৎ চোখের সামনে দেখি। সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, তাও দেখি। আপনার নাম শুনেছি, ছবিও দেখেছি কাগজে। সে দিন আপনার চেহারাটা মনে করতেই দেখি আপনি এসে হাজির।'

'এ জিনিস দেড় মাস থেকে হচ্ছে আপনার ?'

'হ্যাঁ। তা দেড় মাসই হবে। খুব জল হচ্ছিল সে দিন, আর তার সঙ্গে মেঘের ডাক। দুপুর বেলা। দাওয়ায় বসে গোলা তেঁতুলের আচার খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে বিশ হাত দূরে মিত্তিরদের বাড়ির ভেরেণ্ডা গাছের পিছন দিকে একটা আগুনের গোলার মতো কী যেন শূন্যে ঘোরাফেরা করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিলুবাবু, গোলাটা এল ঠিক আমারই দিকে। যেন একটি জ্যোতির্ময় ফুটবল। উঠোনে তুলসীর কাছ অবধি আসতে দেখেছি এটা মনে

আছে, তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান হল যখন তখন জল থেমে গেছে। আমি ছিলাম তক্তপোশে ; তিনটে বেড়ালছানা খেলা করছিল উঠোনে, দাওয়ার ঠিক সামনেই। সে তিনটে মরে গেছে। অথচ আমার গায়ে আঁচড়টি নেই। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা মাদার গাছ আর একটা কতবেল গাছ ছিল, দুটোই পুড়ে ঝামা।'

'আর বাড়ির অন্য লোক ?'

'ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ছোট ভাই ছিল ইস্কুলে ; সে মাকড়দা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। মা নেই ; বাবা ছিলেন ননী ঘোষের বাড়ি, দাবার আড্ডায়। ঠাকুমার অসুখ। খাটে শুয়ে ছিলেন পিছন দিকের ঘরে, তাঁর কিচ্ছু হয়নি।'

বর্ণনা শুনে মনে হল, 'বল লাইটনিং'-এর কথা বলছেন ভদ্রলোক। ক্বচিৎ কদাচিৎ এ ধরনের বিদ্যুতের কথা শোনা যায়, যেটা ঠিক বলেরই আকার ধরে কিছুক্ষণ শূন্য দিয়ে ভেসে বেড়িয়ে হঠাৎ এক্সপ্লোড করে। সে বিদ্যুৎ একটা মানুষের কাছ দিয়ে যাবার ফলে যদি দেখা যায় যে, সে মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে গেছে, তা হলে বলার কিছু নেই। কাছাকাছি বাজ পড়ে কালা কানে শুনেছে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, এমন খবরও কাগজে পড়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের শক্তির দৌড় কত দূর।

প্রশ্নটা করার আগেই উত্তরের খানিকটা আভাস পেয়ে গেলাম।

নকুড়বাবু হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'থ্রি এইট এইট এইট নাইন ওয়ান সেভেন ওয়ান।' দেখলাম, তিনি চেয়ে রয়েছেন সামনে টেবিলের উপর রাখা আমেরিকান সাপ্তাহিক 'টাইম'-এর মলাটের দিকে। মলাটে যাঁর ছবি রয়েছে, তিনি হলেন মার্কিন ক্রোড়পতি পেট্রস সারকিসিয়ান। ছবির দিকে চেয়েই নকুড়বাবু বলে চলেছেন, 'সাহেবের ঘরে একটা সিন্দুক দেখতে পাচ্ছি—খাটের ডান পাশে—ক্রস্কলি কোম্পানির তৈরি—ভিতরে টাকা—বান্ডিল বান্ডিল একশো ডলারের নোট...'

'আর আপনি যে নম্বরটা বললেন, সেটা কী ?'

'ওটা সিন্দুকটা খোলার নম্বর। ডালার গায়ে একটা দাঁতকাটা চাকার মতো জিনিস, আর সেটাকে ঘিরে খোদাই করা এক থেকে নয় অবধি নম্বর। চাকাটা এদিকে, ওদিকে ঘোরে। নম্বর মিলিয়ে ঘোরালেই খুলে যাবে সিন্দুক।'

কথাটা বলে হঠাৎ একটা ভীষণ কুণ্ঠার ভাব করে ভদ্রলোক বললেন, 'অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু। এ সব কথা আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে বলতে আসা মানেই আপনার মূল্যবান সময়—'

'মোটেই না,' আমি বাধা দিয়ে বললাম। 'আপনার মতো ক্ষমতা একটা দুর্লভ ব্যাপার। আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াটা একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। আমি শুধু জানতে চাই—'

'আমি বলছি আপনাকে। আপনি জানতে চাইছেন, 'বল লাইটনিং'-এর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে আর কী কী বিশেষ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে, এই তো ?'

নির্ভুল অনুমান। বললাম, 'ঠিক তাই।'

নকুড়বাবু বললেন, 'মুশকিল হচ্ছে কী জানেন ? এগুলোকে তো আর 'বিশেষ ক্ষমতা' বলে ভাবতে পারি না আমি ! মানুষ যে হাসে বা কাঁদে বা হাই তোলে বা নাক ডাকায়—এগুলোকে কি আর মানুষ বিশেষ ক্ষমতা বলে মনে করে ? এ তো নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। আমিও যা করছি, সেগুলো বিশেষ ক্ষমতা ভেবে করছি না। যেমন ধরুন আপনার ওই টেবিলটা। ওটার ওপর কী রয়েছে বলুন তো ?'

আমি ভদ্রলোকের ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমার ঘরের কোণে রাখা কাশ্মীরি টেবিলটার

দিকে দেখলাম।

টেবিলের উপর একটা জিনিস রয়েছে, যেটা এর আগে কোনও দিন দেখিনি। সেটা একটা পিতলের মূর্তি—যদিও খুব স্পষ্ট নয়। যেন একটা স্পন্দনের ভাব, একটা স্বচ্ছতা রয়েছে মূর্তিটার মধ্যে। দেখতে দেখতেই মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

'কী দেখলেন?'

'একটা পিতলের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। তবে ঠিক নিরেট নয়।'

'ওই তো বললুম। এখনও ঠিক রপ্ত হয়নি ব্যাপারটা। মূর্তিটা রয়েছে আমাদের উকিল শিবরতন মল্লিকের বাড়ির বৈঠকখানায়। একবার দেখেছিলুম। এখনকার মতো আপনার ওই টেবিলে আছে বলে কল্পনা করলুম, কিন্তু পুরোপুরি এল না।'

আমি মনে মনে বলছিলাম, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও জাদুকর (একমাত্র চিনে জাদুকর চী চিং ছাড়া) আমাকে হিপ্নোটাইজ করতে পারেনি। ইনি কিন্তু অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। এও একরকম সম্মোহন বইকী! নকুড় বিশ্বাসের একাধিক ক্ষমতার মধ্যে এটাও একটা। হিপ্নোটিজম, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স বা অলোকদৃষ্টি—এ সব ক'টা ক্ষমতাই দেখছি একসঙ্গে পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

'শিবরতনবাবুর কাছেই আপনার কথা প্রথম শুনি,' বললেন নকুড়বাবু। 'তাই ভাবলুম, একবার গিরিডিটা হয়ে আসি। আপনার দর্শনটাও হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু সাবধানও করে দিতে পারব।'

'সাবধান?'

'আজ্ঞে কিছু মনে করবেন না, তিলুবাবু, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আমি জানি, আপনি তো শুধু আমাদের দেশের লোক নন; সারা বিশ্বে আপনার সম্মান। পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই আপনার ডাক পড়ে, আর আপনাকে সে সব ডাকে সাড়াও দিতে হয়। কিন্তু সাও পাউলোর ব্যাপারটাতে গেলে, আপনাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।'

সাও পাউলো হল ব্রেজিলের সবচেয়ে বড় শহর। সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও

ডাক আসেনি আমার। বললাম, 'সাও পাউলোতে কী ব্যাপার ?'

'আজ্ঞে সেটা এখনও ঠিক বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা এখনও ঠিক স্পষ্ট নয় আমার কাছে। সত্যি বলতে কী, সাও পাউলো যে কোথায় তাও আমি জানি না। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলুম একটা লম্বা সাদা খাম, তার উপর টাইপ করা আপনার নাম ও ঠিকানা, খামের এক কোণে একটা নতুন ডাকটিকিট, তার উপর একটা ছাপ পড়ল—'সাও পাউলো'—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আর তার পরমুহূর্তেই দেখলুম একটা সুদৃশ্য কামরা, তাতে এক বিশালবপু বিদেশি ভদ্রলোক আপনার দিকে চেয়ে বসে আছেন। লোকটিকে দেখে মোটেই ভাল লাগল না।'

দশ মিনিট হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক উঠে পড়েছিলেন, আমি বসতে বললাম। অন্তত এক কাপ কফি না খাইয়ে ছাড়া যায় না ভদ্রলোককে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কী উপায়, সেটাও জানা দরকার।

ভদ্রলোক রীতিমতো সংকোচের সঙ্গে আধা ওঠা অবস্থা থেকে বসে পড়লেন। বললাম, 'আপনি উঠেছেন কোথায় ?'

'আজ্ঞে, উঠেছি মনোরমা হোটেলে।'

'থাকবেন ক' দিন ?'

'যে কাজের জন্য আসা, সে কাজ তো হয়ে গেল। কাজেই...'

'কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে জানা দরকার।'

লজ্জায় ভদ্রলোকের ঘাড় বেঁকে গেল। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'আমার ঠিকানা আপনি চাইছেন, এ তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

এবার ভদ্রলোককে একটু কড়া করেই বলতে হল যে, তাঁর বিনয়টা একটু আদিখ্যেতার মতো হয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'আপনি জেনে রাখুন যে, আপনার সঙ্গে মাত্র দশ মিনিটের পরিচয়ের পর একেবারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা যে কোনও বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই একটা আপশোসের কারণ হতে পারে।'

'আপনি 'কেয়ার অফ হরগোপাল বিশ্বাস, মাকড়দা' দিলেই আমি চিঠি পেয়ে যাব। আমার বাবাকে ওখানে সবাই চেনে।'

'আপনি বিদেশ যাবার সুযোগ পেলে, যাবেন ?'

প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই মাথায় ঘুরছিল। সেটার কারণ আর কিছুই না—অতি প্রাকৃত ক্ষমতা বা ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিমে অনেক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা হেসে উড়িয়ে দেবার ভাব লক্ষ করেছি। শ্রীমান নকুড় বিশ্বাসকে একবার তাদের সামনে নিয়ে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। আমি নিজে অবিশ্যি এই সন্দেহবাদীদের দলে নেই। নকুড়বাবুর এই ক্ষমতা আমি মোটেই অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসের চোখে দেখি না। মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা এখনও স্পষ্টভাবে কিছুই জানি না। আমার ঠাকুরদা বটুকেশ্বর ছিলেন শ্রুতিধর। একবার শুনলে বা পড়লেই একটা গোটা কাব্য তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অথচ তিনি পুরোদস্তুর সংসারী লোক ছিলেন ; এমন না যে, দিনরাত কেবল পড়াশুনা বা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতেন। এটা কী করে সম্ভব হয় সেটা কি পশ্চিমের কোনও বৈজ্ঞানিক সঠিক বলতে পারে ? পারে না, কারণ তারা এখনও মস্তিষ্কের অর্ধেক রহস্যই উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে নকুড়বাবু এমন ভাব করলেন, যেন আমি উন্মাদের মতো কিছু বলে ফেলেছি।

'আমি বিদেশ যাব ?' চোখ কপালে তুলে বললেন নকুড়বাবু। 'কী বলছেন আপনি তিলুবাবু ? আর যদি বা ইচ্ছেই থাকত, আমার মতো লোকের পক্ষে সেটা সম্ভবই বা হত কী

করে ?'

আমি বললাম, 'বাইরের অনেক বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানই কোনও বিজ্ঞানী সম্মেলনে কাউকে আমন্ত্রণ জানালে, তাঁকে দুটো প্লেনের টিকিট দিয়ে থাকেন, এবং সেখানে দুজনের থাকার খরচ বহন করে থাকেন। কেউ কেউ নিয়ে যান স্ত্রীকে, কেউ বা সেক্রেটারিকে। আমি অবশ্য একাই গিয়ে থাকি, কিন্তু আপনি যেতে সম্মত হলে—'

নকুড়বাবু একসঙ্গে মাথা নেড়ে, জিভ কেটে আমার প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানিয়ে উঠে পড়লেন।

'আপনি যে আমার কথাটা ভেবেছেন, সেইটেই আমার অনেক পাওয়া। এর বেশি আর আমি কিছু চাই না।'

আমি কিছুটা ঠাট্টার সুরে বললাম, 'যাই হোক, যদি আপনার দিব্যদৃষ্টিতে কোনওদিন আপনার বিদেশ যাবার সম্ভাবনা দেখতে পান, তা হলে আমাকে জানাবেন।'

নকুড়বাবু যেন আমার রসিকতাটা উপভোগ করেই মৃদু হেসে দু হাতে কোঁচার গোছটা তুলে নিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার প্রণাম রইল। নিউটনকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।'

২১শে জুন

কসমস পত্রিকার জন্য প্রবন্ধটা কাল পাঠিয়ে দিলাম।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্রের আর কোনও খবর পাইনি। সে নিজে না দিলে আর কে দেবে খবর। আমার দিক থেকে খুব বেশি আগ্রহ দেখানোটাও ঠিক নয়, তাই ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আমি তাকে চিঠি লিখিনি। অবিশ্যি ইতিমধ্যে আমার দুই বন্ধু সন্ডার্স ও ক্রোলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি। তারা দু'জনেই গভীর কৌতূহল প্রকাশ করেছে। ক্রোল বলছে, নকুড় বিশ্বাসকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ডেমনস্ট্রেশনের জন্য খরচ সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা হবে না। এমন কী, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ইত্যাদির জোরে নকুড় বিশ্বাস বেশ কিছু টাকা হাতে নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। আমি জানিয়ে দিয়েছি, মাকড়দাবাসীর কাছ থেকে উৎসাহের কোনও ইঙ্গিত পেলেই জানাব।

২৪শে জুলাই

গত একমাসে আমার প্রবন্ধটা সম্পর্কে একশো সাতাত্তরটা চিঠি পেয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। সবই অভিনন্দনসূচক। তার মধ্যে একটি চিঠি হল এক বিরাট মার্কিন কেমিক্যাল কর্পোরেশনের মালিক সলোমন ব্লুমগার্টেনের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন যে, আমার অন্তত তিনটি আবিষ্কারের পেটেন্টস্বত্ব তিনি কিনতে রাজি আছেন। তার জন্য তিনি আমাকে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত। আবিষ্কার তিনটি হল অ্যানাইহিলিন পিস্তল, মিরাকিউরল বড়ি ও অমনিস্কোপ যন্ত্র। যদিও আমি প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে, এ সব জিনিস কারখানায় তৈরি করা যায় না, সে কথাটা ব্লুমগার্টেন মানতে রাজি নন। তাঁর ধারণা, একজন মানুষ নিজে হাতে যেটা তৈরি করতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে সেটা তৈরি না করতে পারার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। এ সব ব্যাপারে চিঠি মারফত তর্ক করা বৃথা ; তাই আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ব্যক্তিগত কারণে আমি পেটেন্ট রাইটস বিক্রি করতে রাজি নই।

পঁচাত্তর হাজার ডলারেও আমার লোভ লাগল না দেখে সাহেবের না জানি কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

১৭ই আগস্ট

আজ এক অপ্রত্যাশিত চিঠি। লিখছেন শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। চিঠির ভাব ও ভাষা দুই-ই অপ্রত্যাশিত। তাই সেটা তুলে দিচ্ছি—

শ্রীত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং—

মহাশয়,

অধমকে যে আপনি স্মরণে রাখিয়াছেন সে বিষয়ে অবগত আছি। অবিলম্বে সাও পাউলো হইতে আমন্ত্রণ আপনার হস্তগত হইবে। আপনি সঙ্গত কারণেই উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিতে পারিবেন না। আপনার স্মরণে থাকিবে যে, আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আপনার দাসানুদাস সেক্রেটারিরূপে আপনার সহিত বিদেশ গমনের জন্য। তৎকালে সম্মত হই নাই, কিন্তু স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ক্রমে উপলব্ধি করিয়াছি যে, সাও পাউলোতে আপনার পার্শ্বে উপস্থিত না থাকিলে আপনার সমূহ বিপদ। আমি গত কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রমে পিটম্যান পদ্ধতিতে শর্টহ্যান্ড বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। উপরন্তু এটিকেট সম্পর্কে কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য আদব কায়দা কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে আপনার অনুচর রূপে সঙ্গে লইবার ব্যাপারে কী স্থির করেন তাহা পত্রপাঠ জানাইলে বাধিত হইব। আপনি ভারতের তথা বিশ্বের গৌরব। সর্বোপরি আপনি বঙ্গসন্তান। আপনার দীর্ঘ, রোগমুক্ত, নিঃসঙ্কট জীবন আমাদের সকলেরই কাম্য। ইতি।

সেবক শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—আমার সঙ্গে বাইরে যাবার ব্যাপারে হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ যেটা বলেছেন নকুড়বাবু, সেটা কি সত্যি ? নাকি এর মধ্যে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে ? ভদ্রলোক কি আসলে গভীর জলের মাছ ? চিঠির ভাব ও ভাষা কি আসলে আদিখ্যেতা ?

লোকটার মধ্যে সত্যিই কতকগুলো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বলে এই প্রশ্নগুলো আসছে। অবিশ্যি এখন এ বিষয়ে ভেবে লাভ নেই। আগে নেমন্তন্নটা আসে কি না দেখা যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩রা সেপ্টেম্বর

নকুড়বাবু আবার অবাক করলেন। আমন্ত্রণ এসে গেছে। আরও অবাক হয়েছি এই কারণে যে, এ আমন্ত্রণ সত্যিই ঠেলা যাবে না। সাও পাউলোর বিখ্যাত রাটানটান ইন্সটিটিউট একটা তিনদিন ব্যাপী বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, যেখানে বক্তৃতা, আলোচনাসভা ইত্যাদি তো হবেই, তা ছাড়া সম্মেলনের শেষ দিনে ইনস্টিটিউট আমাকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবে। কসমসের প্রবন্ধই আসলে নতুন করে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের জগতে। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যে শুধু আমার উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন তা নয়, আমার সব ক'টি ইনভেনশন এবং সেই সঙ্গে সেই সংক্রান্ত আমার গবেষণার কাগজপত্রের একটি প্রদর্শনী করবেন বলে প্রস্তাব করেছেন। এ ব্যাপারে দিল্লির ব্রেজিলীয় এমব্যাসির সঙ্গে ভারত সরকার সব রকম সহায়তা করতে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন।

ইনস্টিটিউট জানিয়েছেন যে, তাঁদের আতিথেয়তা তিন দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, অন্তত আরও সাতদিন থেকে যাতে আমি ব্রেজিল ঘুরে দেখতে পারি সে ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করবেন। দু'জনের জন্য থাকার এবং যাতায়াতের খরচ তাঁরা বহন করবেন।

আমি যাব বলে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, আর এও জানিয়ে দিয়েছি যে আমার সঙ্গে থাকবেন আমার সেক্রেটারি মিঃ এন সি বিসওয়াস।

মাকড়দাতেও অবিশ্যি চিঠি চলে গেছে। কনফারেন্স শুরু হচ্ছে ১০ই অক্টোবর। এই এক মাসের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব বলে মনে হয়।

সন্ডার্স ও ক্রোলকে খবরটা দিয়ে দিয়েছি। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক হিসাবে দু'জনেই সাও পাউলোতে আমন্ত্রিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস, তবে নকুড়বাবুর খবরটা জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। তাকে নিয়ে এ যাত্রা বিশেষ মাতামাতি করা যাবে না সেটাও জানিয়ে দিয়েছি। ক্রোল নিজে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী ও ওয়াকিবহাল। হোটেলের ঘরে বসে বিশেষ করে তাঁর জন্য সামান্য ডেমনস্ট্রেশন দিতে নকুড়বাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আমার আসন্ন বিপদের কথাটা সত্যি কি মিথ্যে জানি না। আমার মনে মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে যে, নকুড়বাবু নিখরচায় বিদেশ দেখার লোভটা সামলাতে পারেননি। আমি লিখেছি তিনি যেন রওনা হবার অন্তত তিনদিন আগে আমার কাছে চলে আসেন। তাঁর আদবকায়দার দৌড় কতটা সেটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। ভাষা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ইংরিজিটা মনে হয় ভদ্রলোক একরকম নিজেই চালিয়ে নিতে পারবেন ; আর, কোনও বিশেষ অবস্থায় যদি ব্রেজিলের ভাষা পর্তুগিজ বলার প্রয়োজন হয়, তার জন্য তো আমিই আছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর্তুগিজদের ভূমিকার কথা মনে করে আমি এগারো বছর বয়সে গিরিডির পর্তুগিজ পাদরি ফাদার রেবেলোর কাছ থেকে ভাষাটা শিখে নিয়েছিলাম।

২রা অক্টোবর

আজ নকুড়বাবু এসেছেন। এই ক'মাসে ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা উন্নতি লক্ষ করছি। বললেন, যোগব্যায়ামের ফল। ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে ভদ্রলোক দুটো স্যুট করিয়ে এনেছেন, সেই সঙ্গে শার্ট টাই জুতো মোজা ইত্যাদিও জোগাড় হয়েছে। দাঁতনের অভ্যাস বলে নতুন টুথপেস্ট টুথব্রাশ কিনতে হয়েছে। স্যুটকেস যেটা এনেছেন, সেটা নাকি আসলে উকিল শিবরতন মল্লিকের। সেটি যে এনার কাছে কী করে এল, সেটা আর জিজ্ঞেস করলাম না।

'ব্রেজিলের জঙ্গল দেখতে যাবেন না?' আজ দুপুরে খাবার সময়ে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, 'সাতদিন তো ঘুরিয়ে দেখাবে বলেছে ; তার মধ্যে অরণ্য কি আর একেবারে বাদ পড়বে?'

নকুড়বাবু বললেন, 'আমাদের শ্রীগুরু লাইব্রেরিতে খোঁজ করে বরদা বাঁড়ুজ্যের লেখা ছবি টবি দেওয়া একটা পুরনো বই পেলাম ব্রেজিল সম্বন্ধে। তাতে লিখেছে ওখানকার জঙ্গলের কথা, আর লিখেছে সেই জঙ্গলে এক রকম সাপ আছে, যা নাকি লম্বায় আমাদের অজগরের ডবল।'

মোট কথা ভদ্রলোক খোশমেজাজে আছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও নতুন ক্ষমতার পরিচয় দেননি। সত্যি বলতে কী, সে প্রসঙ্গ আর উত্থাপনই করেননি।

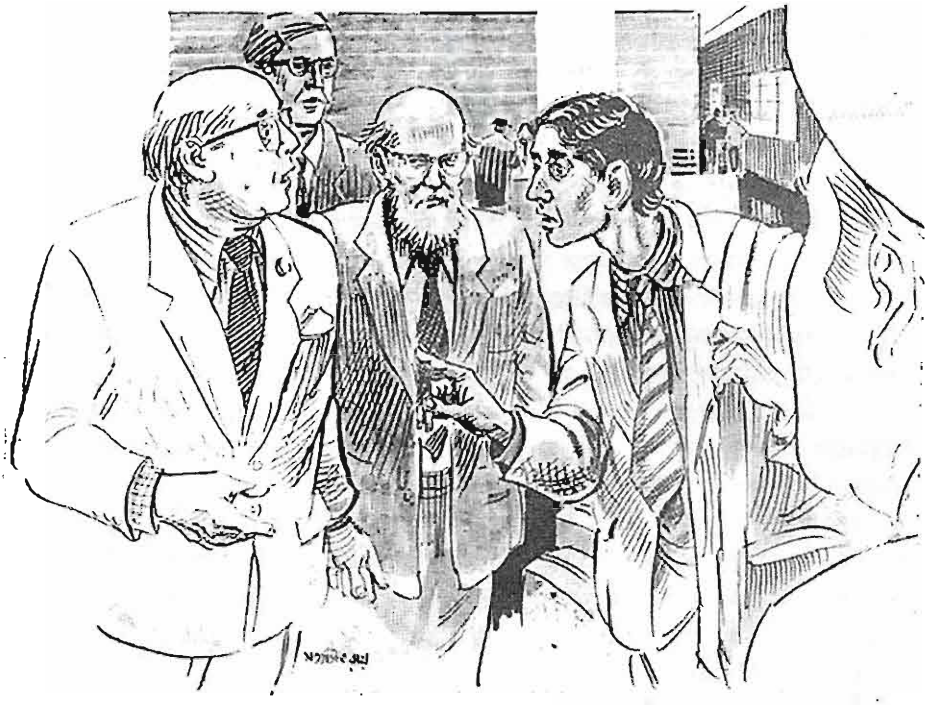

ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনেই সাও পাউলো যাচ্ছে বলে লিখেছে। বলা বাহুল্য, দুজনেই নকুড়বাবুকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

১০ই অক্টোবর, সাও পাউলো, রাত সাড়ে এগারোটা

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে, কনফারেন্সের কর্ণধার প্রোফেসর রডরিগেজের বাড়িতে ডিনার খেয়ে আধ ঘণ্টা হল ফিরেছি হোটেলে। শহরের প্রান্তে সমুদ্রের ধারে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত হোটেলকে হার মানানো এই গ্র্যান্ড হোটেল। আমন্ত্রিতরা সকলেই এখানে উঠেছেন। আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি বিশাল সুসজ্জিত 'সুইট'—নম্বর ৭৭৭। আমার সেক্রেটারি নকুড় বিশ্বাস একই তলায় আছেন ৭১২ নং সিঙ্গল রুমে।

এখানকার কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে ক্রোল ও সন্ডার্সও গিয়েছিল এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে। সেখানেই নকুড়বাবুর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিই। ক্রোলের সঙ্গে পরিচয় হতেই নকুড়বাবু জার্মান ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, 'আলপস—বাভারিয়ান আলপস—নাইনটিন থার্টি টু—ইউ অ্যান্ড টু ইয়ং মেন ক্লাইমবিং, ক্লাইমবিং—দেন স্লিপিং, স্লিপিং, স্লিপিং—দেন—উফ্‌ফ্‌—ভেরি ব্যাড!'

ক্রোল দেখি মুখ হাঁ করে সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছে নকুড়বাবুর দিকে। তারপর আর থাকতে না পেরে জার্মান ভাষাতেই চেঁচিয়ে উঠল—'আমার পা হড়কে গিয়েছিল। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে হারম্যান ও কার্ল দুজনেরই প্রাণ যায়!'

কথাটা বাংলায় অনুবাদ করে দিতে নকুড়বাবুও বাংলায় বললেন, 'দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বলতে চাইনি। বড় মর্মান্তিক ঘটনা ওঁর জীবনের।'

বলা বাহুল্য, ক্রোলকে আমার আর নিজের মুখে কিছু বলতে হয়নি। আমি জানি, সন্ডার্স এ ধরনের ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ খানিকটা সন্দেহ পোষণ করে। সে প্রথমে কোনও মন্তব্য করেনি ; এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আমার পাশে বসে একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, 'ক্রোলের যুবা বয়সের এ ঘটনাটা তুমি জানতে ?'

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম।

এর পরে আর এ নিয়ে কোনও কথা হয়নি।

আজ ডিনারে প্রোঃ রডরিগেজের সেক্রেটারি মিঃ লোবোর সঙ্গে আলাপ হল্। এখানকার অনেকেরই গায়ের রং যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আর চোখের মণি এবং মাথার চুল কালো। মিঃ লোবোও এর ব্যতিক্রম নন। বেশ চালাকচতুর ভদ্রলোক। ইংরিজিটাও মোটামুটি ভাল জানেন, ঘণ্টাখানেক আলাপেই আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছেন। তাঁকে বললাম যে, আমাদের খুব ইচ্ছে কনফারেন্সের পর ব্রেজিলের জঙ্গলের কিছুটা অংশ ঘুরে দেখা। 'নিশ্চয়, নিশ্চয় !' বললেন মিঃ লোবো, যদিও বলার ঢঙে কোথায় যেন একটা কৃত্রিমতার আভাস পেলাম। আসলে এঁরা হয়তো চাইছেন, অতিথিদের ব্রেজিলের আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখাতে।

আজ আলোচনাসভায় আমি ইংরাজিতে বক্তৃতা করেছিলাম। আমার সেক্রেটারি সে বক্তৃতার সম্পূর্ণটাই শর্টহ্যান্ডে লিখে রেখেছেন। আমি জানি, আজকের দিনে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে বক্তৃতা তুলে রাখাটাই সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায় ; কিন্তু নকুড়বাবু এত কষ্ট করে পিটম্যান শিখে এসেছেন, তাই মনে হল তাঁকে সেটার সদ্ব্যবহার করতে দেওয়াটাই ভাল।

আমার আবিষ্কার ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার কাগজপত্রের প্রদর্শনীও আজই খুলল। যে সব জিনিস এতকাল গিরিডিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমার আলমারির মধ্যে পড়ে ছিল, সেগুলো হঠাৎ আজ পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে ব্রেজিলের শহরে প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। সত্যি বলতে কী, একটু যে ভয়ও করছিল না, তা নয়, যদিও ব্রেজিল সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন ভালই। প্রদর্শনীর দরজার বাইরে এবং রাটানটান ইনস্টিটিউটের ফটকে সশস্ত্র পুলিশ। কাজেই ভয়ের কারণ নেই।

১২ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে ছ'টা

গতকাল বেশ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল।

কাল লাঞ্চের পর আমি আমার দুই বিদেশি বন্ধু ও সেক্রেটারি সমেত শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিছু কেনাকাটা সেরে বিকেলে হোটেলে ফিরে নকুড়বাবু তাঁর ঘরে চলে গেলেন। এটা লক্ষ করছি যে, ঠিক যতটুকু সময় আমার সঙ্গে না থাকলে নয়, তার এক মিনিটও বেশি থাকেন না ভদ্রলোক। ক্রোল আর সন্ডার্সও আমার ঘরে বসে কফি খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল ; কথা হল, স্নান করে এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলের লবিতে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে যাব এখানকার এক সংগীতানুষ্ঠানে।

ব্রেজিলের কফির তুলনা নেই, তাই আমি নিজের জন্যে সবে আরেক পেয়ালা ঢেলেছি, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'হ্যালো' বলাতে উলটো দিক থেকেই বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন এল—

'ইজ দ্যাট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু ?'

আমি জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

'দিস ইজ সলোমন ব্লুমগার্টেন।'

নামটা মনে পড়ে গেল। ইনিই গিরিডিতে চিঠি লিখে আমার তিনটে আবিষ্কারের পেটেন্ট স্বত্ব কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

'চিনতে পেরেছ আমাকে?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'বিলক্ষণ।'

'একবার আসতে পারি কি? আমি এই হোটেলের লবি থেকেই ফোন করছি।'

আমার মুশকিল হচ্ছে কী, এ সব অবস্থায় সরাসরি কিছুতেই 'না' বলতে পারি না, যদিও জানি, এঁর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। অগত্যা ভদ্রলোককে আসতেই বলতে হল।

মিনিটতিনেক পরে যিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠিক তেমন একজন মানুষকে আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভাগ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই ঘরে; থাকলে সব দিক দিয়েই প্রমাণ সাইজের প্রায় দেড়া এই মানুষটির পাশে আমার মতো একজন মিনি মানুষকে দেখে তিনি কখনওই হাসি সংবরণ করতে পারতেন না।

দাঁড়ানো অবস্থায় এনার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই করমর্দনের ঠেলা কোনওমতে সামলে বললাম, 'বসুন, মিঃ ব্লুমগার্টেন।'

'কল মি সল।'

চোখের সামনে থেকে পাহাড় সরে গেল। ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করেছেন।

'কল মি সল,' আবার বললেন ভদ্রলোক, 'অ্যান্ড আই'ল কল ইউ শ্যাঙ্ক, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।'

সল অ্যান্ড শ্যাঙ্ক। সলোমন ও শঙ্কু। এত চট সৌহার্দ্যের প্রয়োজন কী জানি না, তবে এটা জানি যে, এ ধরনের প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া গতি নেই। বললাম, 'বলো, সল, কী করতে পারি তোমার জন্য।'

'তোমাকে তো বলেইছি চিঠিতে। সেই একই প্রস্তাব আবার করতে এসেছি আমি। আজ তোমার প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করো না,—তোমার এইসব আশ্চর্য আবিষ্কার বিশ্বের কাছে গোপন রেখে তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর কাজ করেছ।'

দানবাকৃতি মানুষটি বসে পড়াতে আমার স্বাভাবিক মনের জোর অনেকটা ফিরে এসেছে। বললাম, 'তুমি কি মানবকল্যাণের জন্য এতই ব্যগ্র? আমার তো মনে হয়, তুমি আবিষ্কারগুলোর ব্যবসার দিকটাই দেখছ, তাই নয় কি?'

মুহূর্তের জন্য সলোমন ব্লুমগার্টেনের লোমশ ভুরু দুটো নীচে নেমে এসে চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলে আবার তখনই যথাস্থানে ফিরে গেল।

'আমি ব্যবসায়ী, শ্যাঙ্ক, তাই ব্যবসার দিকটা দেখব—তাতে আশ্চর্যের কী? কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করে তো নয়! তোমাকে আমি এক লাখ ডলার দিতে প্রস্তুত আছি ওই তিনটি আবিষ্কারের স্বত্বের জন্য। চেকবই আমার সঙ্গে আছে। নগদ টাকা চাও, তাও দিতে পারি—তবে এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে তোমারই অসুবিধা হবে।'

আমি মাথা নাড়লাম। চিঠিতে যে কথা বলেছিলাম, সেটাই আবার বললাম যে, আমার এই জিনিসগুলো কোনওটাই মেশিনের সাহায্যে কারখানায় তৈরি করা সম্ভব নয়।

গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে ব্লুমগার্টেন বেশ কিছুক্ষণ সটান আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন চারটি ইংরিজি শব্দ।

'আই ডোন্ট বিলিভ ইউ।'

'তা হলে আর কী করা যায় বলো!'

'আই ক্যান ডাবল মাই প্রাইস, শ্যাঙ্ক!'

কী মুশকিল। লোকটাকে কী করে বোঝাই যে, আমি দিব্যি আছি, আমার আর টাকার দরকার নেই, এক লক্ষের জায়গায় বিশ লাখ পেলেও আমি স্বত্ব বিক্রি করব না।

ভদ্রলোক কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, আমার সেক্রেটারি।

'ইয়ে—' ভারী কিন্তু কিন্তু ভাব করে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন। —'কাল সকালের প্রোগ্রামটা— ?'

এইটুকু বলে ব্লুমগার্টেনের দিকে চোখ পড়াতে নকুড়বাবু হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেললেন।

ভারী অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। ব্লুমগার্টেনকে হঠাৎ দেখলে অনেকেরই কথার খেই হারিয়ে

যেতে পারে। কিন্তু নকুড়বাবু যেন শুধু হারাননি ; সেই সঙ্গে কিছু যেন পেয়েছেনও তিনি।

'কালকের প্রোগ্রামের কথা জানতে চাইছিলেন কি ?'

পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করার জন্য প্রশ্নটা করলাম আমি।

প্রশ্নের উত্তরে যে কথাটা নকুড়বাবুর মুখ দিয়ে বেরোল, সেটা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ব্লুমগার্টেনের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ভদ্রলোক মৃদু স্বরে দুবার 'এল ডোরাডো' কথাটা উচ্চারণ করে কেমন যেন হতভম্ব ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'হু ওয়াজ দ্যাট ম্যান ?'

আমি দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন সলোমন ব্লুমগার্টেন।

আমি বললাম, 'আমার সেক্রেটারি।'

'এল ডোরাডো কথাটা বলল কেন হঠাৎ ?'

ব্লুমগার্টেনের ধাঁধালো ভাবটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। বললাম, 'দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছেন ভদ্রলোক, কাজেই 'এল ডোরাডো' নামটা জানা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

সোনার শহর এল ডোরাডোর কিংবদন্তির কথা কে না জানে ? ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন থেকে কোর্টেজের সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকায় এসে স্থানীয় অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে এ দেশে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করে। তখনই এখানকার উপজাতিদের মুখে এল ডোরাডোর কথা শোনে স্পেনীয়রা, আর তখন থেকেই এ নাম চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে ধনলিপ্সু পর্যটকদের। ইংল্যান্ডের স্যার ওয়লটর র‍্যালে পর্যন্ত এল ডোরাডোর টানে নৌবহর নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই দেশে। কিন্তু এল ডোরাডো চিরকালই অন্বেষণকারীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। পেরু, বোলিভিয়া, কলোম্বিয়া, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা—দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দেশেই এল ডোরাডোর কোনও সন্ধান মেলেনি।

ব্লুমগার্টেন হতবাক্ হয়ে টেবিলল্যাম্পের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে আমি বাধ্য হয়েই বললাম, 'আমাকে বেরোতে হবে একটু পরেই ; কাজেই তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে তা হলে—'

'ভারতীয়রা তো জাদু জানে।' আমার কথা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল ব্লুমগার্টেন।

আমি হেসে বললাম, 'তাই যদি হত, তা হলে ভারতে এত দারিদ্র্য থাকত কি ? জাদু জানলেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জাদু তারা নিশ্চয়ই জানে না।'

'সে তো তোমাকে দিয়েই বুঝতে পারছি,' ব্যঙ্গের সুরে বলল ব্লুমগার্টেন, 'যে দেশের লোক টাকা হাতে তুলে দিলেও সে টাকা নেয় না, সে দেশ গরিব থাকতে বাধ্য। কিন্তু...'

ব্লুমগার্টেন আবার চুপ, আবার অন্যমনস্ক। আমার আবার অসহায় ভাব ; এ লোকটাকে তাড়ানোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।

'জাদুর কথা বলছি এই কারণে,' বলল ব্লুমগার্টেন, 'আমার যে মুহূর্তে এল ডোরাডোর কথাটা মনে হয়েছে, সেই মুহূর্তে নামটা কানে এল ওই ভদ্রলোকের মুখ থেকে। আজ থেকে দুশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা পরপর তিন পুরুষ ধরে উত্তর আমেরিকা থেকে এদেশে পাড়ি দিয়েছে এল ডোরাডোর সন্ধানে। আমি নিজে দু'বার এসেছি যুবা বয়সে। পেরু, বোলিভিয়া, গুইয়ানা, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা—কোনও দেশে খোঁজা বাদ দিইনি। শেষে ব্রেজিলে এসে জঙ্গলে ঘুরে ব্যারাম বাধিয়ে বাধ্য হয়ে এল ডোরাডোর মায়া ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাই। আজ এতদিন পরে আবার ব্রেজিলে এসে কাল থেকে মাঝে মাঝে এল ডোরাডোর কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর আজ...'

আমি কোনও মন্তব্য করলাম না। ব্লুমগার্টেনও উঠে পড়ল। বলল, 'আমি ম্যারিনা

হোটেলে আছি। যদি মত পরিবর্তন কর তো আমাকে জানিও।'

ক্রোল আর সন্ডার্সকে ঘটনাটা বলতে তারা দুজনেই রেগে আগুন। সন্ডার্স বলল, 'তুমি অতিরিক্ত রকম ভদ্র, তাই এই সব লোকের ঔদ্ধত্য হজম কর। এবার এলে আমাদের একটা ফোন করে দিয়ো, আমরা এসে যা করার করব।'

এর পরের ঘটনাটা ঘটল মাঝরাত্তিরে। পরে ঘড়ি দেখে জেনেছিলাম, তখন সোয়া দুটো। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। বিদেশবিভুঁইয়ে এত রাত্তিরে আমার ঘরে কে আসতে পারে?

দরজা খুলে দেখি শ্রীমান নকুড় বিশ্বাস। ফ্যাকাশে মুখ, ত্রস্ত ভাব।

'অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু, কিন্তু না এসে পারলাম না।'

ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, 'আগে বসুন, তারপর কথা হবে।'

সোফায় বসেই নকুড়বাবু বললেন, 'কপি হয়ে গেল।'

কপি? কীসের কপি? এত রাত্তিরে এ সব কী বলতে এসেছেন ভদ্রলোক?

'যন্ত্রটার নাম জানি না,' বলে চললেন নকুড়বাবু, 'তবে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। একটা বাক্সর মতো জিনিস, ভিতরে আলো জ্বলছে, ওপরে একটা কাচ। একটা কাগজ পুরে দেওয়া হল যন্ত্রে; তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই কাগজের লেখা অন্য একটা কাগজে হুবহু নকল হয়ে বেরিয়ে এল।'

শুনে মনে হল, ভদ্রলোক জেরক্স ডুপলিকেটিং যন্ত্রের কথা বলছেন।

'কী কাগজ ছাপা হল?' প্রশ্ন করলাম আমি।

নকুড়বাবুর দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে মুখে।

'কী ছাপা হল?' আবার জিজ্ঞেস করলাম।

নকুড়বাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। সংশয়াকুল দৃষ্টি।

'আপনার আবিষ্কারের সব ফরমুলা,' চাপা গলায় দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললেন নকুড়বাবু।

আমি না হেসে পারলাম না।

'আপনি এই বলতে এসেছেন এত রাত্তিরে? আমার ফরমুলা প্রদর্শনীর ঘর থেকে বেরোবে কী করে? সে তো—'

'ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি হয় না? দলিল চুরি হয় না?' প্রায় ধমকের সুরে বললেন নকুড়বাবু। 'আর ইনি যে ঘরের লোক। ঘরের লোককে পুলিশই বা আটকাবে কেন?'

'ঘরের লোক?'

'ঘরের লোক, তিলুবাবু। মিস্টার লোবো!'

আমার মনে হল ভয়ংকর আবোল তাবোল বকছেন নকুড়বাবু। বললাম, 'এ সব কি আপনি স্বপ্নে দেখলেন?'

'স্বপ্ন নয়!' গলার স্বর তিন ধাপ চড়িয়ে বললেন নকুড়বাবু। 'চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পেলাম এই দশ মিনিট আগে। হাতে টর্চ নিয়ে ঢুকলেন মিঃ লোবো—নিজে চাবি দিয়ে প্রদর্শনীর ঘরের দরজা খুলে। প্রহরী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। লোবো সোজা চলে গেলেন একটা বিশেষ টেবিলের দিকে—যেটার কাচের ঢাকনার তলায় আপনার খাতাপত্তর রয়েছে। ঢাকনা তুলে দুটো খাতা বার করলেন মিঃ লোবো। তারপর অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের তলার একটা আপিসঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেইখানে রয়েছে এই যন্ত্র। কী নাম এই যন্ত্রের তিলুবাবু?'

'জেরক্স', যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম আমি। কেন যেন নকুড়বাবুর কথাটা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু মিঃ লোবো।

'আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত তিলুবাবু,' আবার সেই খুব চেনা কুণ্ঠার ভাব করে বললেন নকুড় বিশ্বাস, 'কিন্তু খবরটা আপনাকে না দিয়ে পারলাম না। অবিশ্যি আমি যখন রয়েছি, তখন আপনার যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যেটা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আগে থাকতে জানতে পারলে একটা মস্ত সুবিধে তো! আসলে নতুন জায়গায় এসে মনটাকে ঠিক সংহত করতে পারছিলাম না, তাই লোবোবাবুর ঘটনাটা আগে থেকে জানতে পারিনি—কেবল বুঝেছিলাম, আপনার একটা বিপদ হবে সাও পাউলোতে।'

নকুড়বাবু আবার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আর আমিও চিন্তিতভাবে এসে বিছানায় শুলাম।

আমার মধ্যে নকুড়বাবুর মতো অতি প্রাকৃত ক্ষমতা না থাকলেও এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, লোবোর মতো লোকের পক্ষে নিজে থেকে এ জিনিস করা সম্ভব নয়। তার পিছনে অন্য লোক আছে। পয়সাওয়ালা লোক।

ভাবলে একজনের কথাই মনে হয়।

সলোমন ব্লুমগার্টেন।

১২ই অক্টোবর, রাত পৌনে বারোটা

আজ রাটানটান ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে ডক্টরেট দেওয়া হল। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, প্রোঃ রডরিগেজ-কে নিয়ে চারজন বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকের আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষণ, ও সবশেষে আমার ধন্যবাদজ্ঞাপন। সব মিলিয়ে মনটা ভারী প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। আজ ডিনারে আমার দুই বন্ধু ও প্রোঃ রডগিরেজের উপরোধে জীবনে প্রথম এক চুমুক শ্যাম্পেন পান করলাম। এটাও একটা ঘটনা বটে।

কাল নকুড়বাবুর মুখে মিঃ লোবোর বিষয় শুনে মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল, আজ ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে মনে হচ্ছে, নকুড়বাবু হয়তো এবার একটু ভুল করেছেন। প্রদর্শনীতে টুঁ মেরে দেখে এসেছি যে, আমার কাগজপত্র ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে হল এগারোটা। ঢুকেই একটা দৃশ্য দেখে একেবারে হকচকিয়ে যেতে হল।

হোটেলের লবিতে চতুর্দিকেই বসার জন্য সোফা ছড়ানো রয়েছে; তারই একটায় দেখি একপাশে বিশালবপু সলোমন ব্লুমগার্টেন ও অন্যপাশে একটি অচেনা বিদেশি ভদ্রলোককে নিয়ে বসে আছেন আমার সেক্রেটারি শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নকুড়বাবু একগাল হেসে উঠে এলেন।

'এনাদের সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করছিলাম।'

ব্লুমগার্টেনও উঠে এলেন।

'কনগ্র্যাচুলেশনস!'

করমর্দনে যথারীতি হাতব্যথা করিয়ে দিয়ে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তুমি কাকে সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছ? ইনি তো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি! আমার চোখের দিকে চেয়ে আমার নাড়িনক্ষত্র বলে দিলেন!'

দু'জনের মধ্যে মোলাকাতটা কীভাবে হল সেটা ভাবছি, তার উত্তর নকুড়বাবুই দিয়ে দিলেন।

'আমার বন্ধু যোগেন বকশীর ছেলে কানাইলালকে একটা পোস্টকার্ড লিখে পোস্ট করার

জন্য এই কাউন্টারে দিতে গিয়ে দেখি, এনারা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে ব্লুমগার্টেনসাহেবই এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। বললেন, কাল আমার মুখে এল ডোরাডোর নাম শুনে ওঁর কৌতূহল হচ্ছে, আমি এল ডোরাডো সম্পর্কে কত দূর জানি। আমি বললুম—আই অ্যাম মুখ্যুসুখ্যু ম্যান—নো এডুকেশন—কাল একটা বেঙ্গলি বইয়ে পড়ছিলাম এল ডোরাডোর কথা। তা, পড়তে পড়তে যেন সোনার শহরটাকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তা ইনি—'

নকুড়বাবুর বাক্যস্রোত বন্ধ করতে হল। ফ্রোল ও সন্ডার্সের মুখের ভাব দেখেই বুঝছিলাম তাদের প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে ব্যাপারটা জানার জন্য। নকুড়বাবু এ পর্যন্ত যা বলেছেন সেটার ইংরেজি তর্জমা করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম আমি। ততক্ষণে অবিশ্যি আমরা তিনজনেই একটা পাশের সোফায় বসে পড়েছি, এবং আমি আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে ব্লুমগার্টেনের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। অন্য বিদেশি ভদ্রলোকটির নাম নাকি মাইক হ্যাচেট। হাবভাবে বুঝলাম, ইনি ব্লুমগার্টেনের বডিগার্ড বা ধামাধারী গোছের কেউ।

এবার ব্লুমগার্টেনই কথা বলল—

'ইওর ম্যান বিসওয়াস ইজ এ রিয়্যাল উইজার্ড। ওকে মাইরনের হাতে তুলে দিলে সে রাতারাতি সোনা ফলিয়ে দেবে, অ্যান্ড ইওর ম্যান উইল বি ওনিং এ ক্যাডিল্যাক ইন থ্রি মানথস টাইম!'

মাইরন লোকটি 'কে' জিজ্ঞেস করাতে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হোলি স্মোক!—মাইরনের নাম শোনোনি? মাইরন এন্টারপ্রাইজেস! অত বড় ইমপ্রেসারিও আর নেই। কত গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে জাদুকর মাইরনের ম্যানেজমেন্টের জোরে দাঁড়িয়ে গেল, আর ইনি তো প্রতিভাধর ব্যক্তি।'

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। নকুড়বাবু শেষটায় রঙ্গমঞ্চে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে নাম কিনবেন ? কই, এমন তো কথা ছিল না !

'অ্যান্ড হি নোজ হোয়্যার এল ডোরাডো ইজ !'

আমি নকুড়বাবুর দিকে দৃষ্টি দিলাম। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। বললাম, 'কী মশাই, আপনি কি সাহেবকে বলেছেন, এল ডোরাডো কোথায় তা আপনি জানেন ?'

'যেটুকু আমি জানি, সেটুকুই বলেছি,' কাঠগড়ার আসামির মতো হাত জোড় করে বললেন নকুড় বিশ্বাস—'বলেছি, এই ব্রেজিলেই আছে এল ডোরাডো। আমরা যেখানে আছি, তার উত্তর পশ্চিমে। একটি পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকার ঠিক মধ্যিখানে এক গভীর জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে এই শহর। কেউ জানে না এই শহরের কথা। মানুষজন বলতে আর কেউ নেই সেখানে। পোড়ো শহর, তবে রোদ পড়লে এখনও সোনা ঝলমল করে। সোনার তোরণ, সোনার পিরামিড, যেখানে সেখানে সোনার স্তম্ভ, বাড়ির দরজা জানালা সব সোনার। সোনা তো আর নষ্ট হয় না, তাই সে সোনা এখনও আছে। লোকজন যা ছিল, হাজার বছর আগে সব লোপ পেয়ে যায়। একবার খুব বর্ষা হয় ; তারপরেই জঙ্গলে এক মারাত্মক পোকা দেখা দেয় ; সেই পোকা থেকেই মড়ক। বিশ্বাস করুন তিলুবাবু, এ সবই আমি পর পর চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখতে পেলুম।'

ক্রোল ও সন্ডার্সের জন্য এই অংশটুকু ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিয়ে ব্লুমগার্টেনকে বললাম, 'তুমি তো তা হলে এল ডোরাডোর হদিস পেয়ে গেলে ; এবার অভিযানের তোড়াজোড় করো। আমরা আপাতত ক্লান্ত, কাজেই আমাদের মাপ করো।—আসুন নকুড়বাবু।'

আমার কথায় ব্লুমগার্টেনের মুখে যে থমথমে ভাবটা দেখা দিল, সেটা যে কোনও লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। আমি সেটা যেন দেখেও দেখলাম না। নকুড়বাবু উঠে এলেন ভদ্রলোকের পাশ ছেড়ে।

আমরা চারজনে গিয়ে বসলাম আমার ঘরে। নকুড়বাবুর ইচ্ছে ছিল সোজা নিজের ঘরে চলে যান, কিন্তু আমি বললাম যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। দুই সাহেব বন্ধুর কাছে বাংলা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নকুড়বাবুকে বললাম, 'দেখুন মশাই, আমি আপনার ভালর জন্যই বলছি—আপনার মধ্যে যে ক্ষমতাটা আছে, সেটা যার তার কাছে এভাবে প্রকাশ করবেন না। আপনার অভিজ্ঞতা কম, আপনি হয়তো লোক চেনেন না, কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি যে, এই ব্লুমগার্টেনের খপ্পরে পড়লে আপনার সর্বনাশ হবে। আপনাকে অনুরোধ করছি—আমাকে না জানিয়ে ফস করে কিছু একটা করে বসবেন না।'

নকুড়বাবু লজ্জায় প্রায় কার্পেটের সঙ্গে মিশে গেলেন। বললেন, 'আমায় মাপ করবেন তিলুবাবু ; আমার সত্যিই অপরাধ হয়েছে। আসলে বিদেশে তো আসিনি কখনও ! মফস্বলের মানুষ, তাই হয়তো মাথাটা একটু ঘুরে গিয়ে থাকবে। আমাকে সাবধান করে দিয়ে আপনি সত্যিই খুব উপকার করলেন।'

নকুড়বাবু উঠে পড়লেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর ক্রোল তার পাইপে টান দিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এল ডোরাডো যদি সত্যিই থেকে থাকে, তা হলে সেটা আমাদের একবার দেখে আসা উচিত নয় কি ?'

আগেই বলেছি, সন্ডার্স এ সব ব্যাপারে ঘোর সন্দেহবাদী। সে ধমকের সুরে বলল, 'দেখো হে জার্মান পণ্ডিত, তিন শো বছর ধরে সোনার স্বপ্ন দেখা অজস্র লোক দক্ষিণ আমেরিকা চষে বেড়িয়েও এল ডোরাডোর সন্ধান পায়নি, আর এই ভদ্রলোকের এই ক'টা কথায় তুমি মেতে

উঠলে ? ওই অতিকায় ইহুদি যদি এ সব কথায় বিশ্বাস করে জঙ্গলে গিয়ে জাগুয়ারের শিকার হতে চান, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। আমাদের যা প্ল্যান হয়েছে তার একচুল এদিক ওদিক হয় এটা আমি চাই না। আমার বিশ্বাস শঙ্কুও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত।'

আমি মাথা নেড়ে সন্ডার্সের কথায় সায় দিলাম। আমাদের প্ল্যান হল, আমরা কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পর প্লেনে করে চলে যাব উত্তরে, ব্রেজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া শহরে। সেখানে একদিন থেকে ছোট প্লেন ধরে আমরা চলে যাব জিঙ্গু ন্যাশনাল পার্কের উত্তর প্রান্তে পোস্টো ডিয়াউয়ারুম শহরে। তারপর বাকি অংশ নদীপথে। জিঙ্গু নদী ধরে নৌকা করে আমরা যাব পোরোরি গ্রামে। পোরোরিতে ব্রেজিলের এক আদিম উপজাতি চুকাহামাইদের কিছু লোক এখনও রয়েছে, যারা এই সে দিন পর্যন্ত ছিল প্রস্তরযুগের মানুষ। ব্রাসিলিয়া থেকেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে এখানকার ভাষায় বলা হয় সেরটানিস্টা। কথাটার মানে হল অরণ্য অভিজ্ঞ। সেরটানিস্টারা উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে অগ্রণী ; তাদের ভাষা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই এরা খুব ভালভাবে জানে।

পোরোরি ছেড়ে আরও খানিকটা পথ উত্তরে গিয়ে ভন মার্টিয়ুস জলপ্রপাত দেখে আবার ব্রাসিলিয়া ফিরে এসে সেখান থেকে প্লেন ধরে যে যার দেশে ফিরব। দিন সাতেকের মধ্যে পুরো সফর হয়ে যাওয়া উচিত, তবে ব্রেজিল সরকার বলেছেন, প্রয়োজনে আতিথেয়তার মেয়াদ তিনদিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা।

সাড়ে এগারোটা বাজে, তাই ক্রোল ও সন্ডার্স উঠে পড়ল। ক্রোল যে আমাদের দু'জনের সঙ্গে একমত নয়, সেটা সে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে—

'আমার অবাক লাগছে শঙ্কু ! যে তুমি তোমার এত কাছের লোককে চিনতে পারছ না ! তোমার এই সেক্রেটারিটির চোখের দৃষ্টিই আলাদা। হোটেলের লবিতে বসে যখন সে এল ডোরাডোর বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন আমি ওর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।'

সন্ডার্স কথাটা শুনে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাতে গেলাস ধরার মুদ্রা করে বুঝিয়ে দিল যে, ক্রোল আজ পার্টিতে শ্যাম্পেনটা একটু বেশি খেয়েছে।

বারোটা বেজে গেছে। শহর নিস্তব্ধ। শুয়ে পড়ি।

১৩ই অক্টোবর, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া, দুপুর আড়াইটা

আমরা ঘণ্টাখানেক হল এখানে পৌঁছেছি। আমরা মানে আমরা তিন বন্ধু ও মিঃ লোবো। লোবো পুরো সফরটাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও সৌজন্যের কোনও অভাব লক্ষ করিনি ভদ্রলোকের ব্যবহারে।

এখানে নকুড়বাবুর কথাটা স্বভাবতই এসে পড়ে, যদিও কোনও প্রসঙ্গের দরকার ছিল না। সোজা বাংলায় বলতে গেলে ভদ্রলোক আমাকে লেঙ্গি মেরেছেন, এবং সেটা যে টাকার লোভেও সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আজ সাও পাউলোতে আমার রুম বয় সকালের কফির সঙ্গে একটা চিঠি এনে দিল। বাংলা চিঠি, আর হস্তাক্ষর আমার চেনা। আগেরটার তুলনায় বলতেই হয়, এটার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই হল চিঠি—

প্রিয় তিলুবাবু,

অধমের অপরাধ লইবেন না। নগদ পাঁচ হাজার ডলারের লোভ সংবরণ করা সম্ভবপর

হইল না। আমার পিতামহী আজ চারি বৎসর যাবৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। আমি সাড়ে আট বৎসর বয়সে আমার মাতৃদেবীকে হারাই। তখন হইতে আমি আমার পিতামহীর দ্বারাই লালিত। শুনিয়াছি, এ দেশে এই রোগের এক আশ্চর্য নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে। ঔষধের মূল্য অনেক। ব্লুমগার্টেনসাহেবের বদান্যতায় এই মহার্ঘ ঔষধ কিনিয়া দেশে ফিরিবার সৌভাগ্য হইবে আমার।

আজ সকালেই আমরা ব্লুমগার্টেনমহাশয়ের ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার বিমানে রওনা হইতেছি। আমাদের লক্ষ্য সাও পাউলোর সাড়ে তিনশো মাইল উত্তর পশ্চিমে একটি অরণ্য অঞ্চল। এই অরণ্যের মধ্যেই এল ডোরাডো অবস্থিত। আমার সাহায্য ব্যতীত ব্লুমগার্টেনমহোদয় কোনওক্রমেই এল ডোরাডো পহুঁছিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রতি অনুকম্পাবশত আমি নির্দেশ দিতে সম্মত হইয়াছি। আমার কার্য সমাধা হইলেই আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইব। আপনাদের যাত্রাপথ আমার জানা আছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন। আমি যদি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার কোনওরূপ সাহায্য করিতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি

দাসানুদাস সেবক
শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

হোটেলের রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, নকুড়বাবু সত্যিই বেরিয়ে গেছেন ভোর ছ'টায়।

'জনৈক বিশালবপু ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে ছিলেন কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন।'

আমার চেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছে সন্ডার্স, এবং সেটা শুধু নকুড়বাবুর উপর নয় ; আমার উপরেও। বলল, 'তোমার আমার মতো লোকের এই ভৌতিক অলৌকিক প্রেতলৌকিক ব্যাপারগুলো থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।'

ক্রোল কিন্তু ব্যাপারটা শুনে বেশ মুষড়ে পড়েছে ; এবং সেটা অন্য কারণে। সে বলল, 'তোমার লোক যখন বলছে আমাদের আবার মিট করবে, তখন বোঝাই যাচ্ছে যে, এল ডোরাডো আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সেক্ষেত্রে আমরাও যে কেন সেখানে যেতে পারি না, সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

আমি আর সন্ডার্স ক্রোলের এই অভিযোগ কানে তুললাম না।

ব্রাসিলিয়া ব্রেজিলের রাজধানী হলেও সাও পাউলোর সঙ্গে কোনও তুলনা চলে না। আমরা হোটেলে পৌঁছোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দলে যে সেরটানিস্টা বা অরণ্যঅভিজ্ঞ ভদ্রলোকটি যাবেন—নাম হাইটর—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। বয়স বেশি না হলেও, চেহারায় একটা অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। তার উপরে ঠাণ্ডা মেজাজ ও স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখে মনে হয়, উপজাতিদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য ইনিই আদর্শ ব্যক্তি। তাঁকে আজ ক্রোল জিজ্ঞেস করেছিল, এল ডোরাডোর সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আজকের দিনে আবার এল ডোরাডোর প্রশ্ন তুলছেন কেন ? সে তো কোনকালে মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে গেছে। এল ডোরাডো তো শহরই নয় ; আসলে ওটা একজন ব্যক্তি। ডোরাডো কথাটা সোনার শহর বা সোনার মানুষ দুইই বোঝায় পর্তুগিজ ভাষায়। সূর্যের প্রতীক হিসেবে কোনও এক বিশেষ ব্যক্তিকে পুরাকালে এখানকার অধিবাসীরা পুজো করত, আর তাকেই বলত এল ডোরাডো।'

চোখের পলকে একজন মানুষকে কখনও এমন হতাশ হতে দেখিনি, যেমন দেখলাম

ক্রোলকে।

কাল সকালে আমাদের আবার যাত্রা শুরু। নকুড়বাবু অন্যায় কাজ করেছেন সেটা ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আমি যে বেশ খানিকটা দায়ী, সেটাও ভুলতে পারছি না। আমিই তো প্রথমে তাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসার প্রস্তাবটা করি।

১৬ই অক্টোবর, বিকেল সাড়ে চারটে

বাহারের নকশা করা ক্যানু নৌকাতে জিঙ্গু নদী ধরে আমরা চলে এসেছি প্রায় তেত্রিশ মাইল। আমরা পাঁচজন—অর্থাৎ আমি, ক্রোল, সন্ডার্স, লোবো আর হাইটর—ছাড়া রয়েছে দু'জন নৌকাবাহী দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ান। আরও দু'জন নৌকাবাহী সহ আর একটি ক্যানুতে চলেছে আমাদের মালপত্র রসদ ইত্যাদি। এখন আমরা নদীর ধারে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গা বেছে সেখানে তাঁবু ফেলেছি। তাঁবুর কাছেই তিনটি গাছে দুটি হ্যামক বাঁধা রয়েছে ; সন্ডার্স ও ক্রোল তার এক একটি দখল করে তাতে শুয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে ব্রেজিলের বিখ্যাত অ্যানাকোন্ডা সাপ নিয়ে। এই অ্যানাকোন্ডা যে সময় সময় বিশাল আকার ধারণ করে, সেটা অনেক পর্যটকের বিবরণ থেকেই জানা যায়। ক্রোলের মতে ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। সন্ডার্স সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। এখানে বলে রাখি যে, আমাদের তিনজনের কেউই চিড়িয়াখানার বাইরে অ্যানাকোন্ডা দেখিনি। এ যাত্রায় আমাদের ভাগ্যে অ্যানাকোন্ডার সাক্ষাৎ পাওয়া আছে কি না জানি না। না থাকলেও আমার অন্তত তাতে আপশোস নেই। লতাগুল্ম ফলমূল কীটপতঙ্গ পশুপাখিতে ভরা ব্রেজিলের জঙ্গলের যে রূপ আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি, তার কোনও তুলনা নেই। বন গভীর ও অন্ধকার হলেও তাতে রঙের অভাব নেই। প্রায়ই চোখে পড়ে লানটানা ফুলের ঝোপ, হরেক রঙের প্রজাপতি আর চোখ ঝলসানো সব কাকাতুয়া শ্রেণীর পাখি। নৌকা চলার সময় জলে হাত দেওয়া বারণ, কারণ নদীতে রাক্ষুসে পিরানহা মাছের ছড়াছড়ি। কালই নদীর ধারে একটা কেইম্যান কুমিরের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম ; তার মাথার দিকের খানিকটা অংশ ছাড়া আর কোথাও মাংস নেই, শুধু হাড়। মাংস গেছে পিরানহার পেটে।

ব্রেজিলের অনেক অংশেই বহুদিন পর্যন্ত বাইরের মানুষের পা পড়েনি। গত বছর দশেকের মধ্যে বেশ কিছু জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রেজিল সরকারের হাইওয়ে বানানোর কাজও চলেছে জঙ্গল কেটে, আর ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে। আমরা আসার পথেও বেশ কয়েক বার ডিনামাইট বিস্ফোরণ বা ব্লাস্টিং-এর শব্দ পেয়েছি। কাল মাঝরাত্রে একটা গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের শব্দে আমাদের ক্যাম্পের সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। শব্দতরঙ্গের চাপ এত প্রবল ছিল যে, ক্রোলের বিয়ার গ্লাসটা তার ফলে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, তাই আজ সকালে হাইটরকে জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি কোনও আগ্নেয়গিরি আছে কি না। হাইটর মুখে কিছু না বলে কেবল গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

১৭ই অক্টোবর, ভোর ছ'টা

কাল রাত্রে এক বিচিত্র ঘটনা।

রাত্রে মশা, আর দিনে জ্বালাতুনে ব্যারাকুডা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি

গিরিডি থেকেই একরকম মলম তৈরি করে এনেছিলাম। তিন বন্ধুতে সেই মলম মেখে সাড়ে ন'টার মধ্যেই যে যার ক্যাম্পে শুয়ে পড়েছিলাম। যদিও এখানে রাত্রে নিস্তব্ধতা বলে কিছু নেই, ঝিঁঝি থেকে শুরু করে জাগুয়ার পর্যন্ত সব কিছুরই ডাক শোনা যায়, তবু দিনের ক্লান্তির জন্য ঘুমটা এসে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। সেই ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল এক বিকট চিৎকারে।

আমি ও সন্ডার্স হন্তদন্ত হয়ে আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ক্রোলও তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তৃতীয় তাঁবু থেকে হাইটর।

কিন্তু মিঃ লোবো কোথায় ?

ক্রোল টর্চটা জ্বালিয়ে এদিক ওদিক ফেলতেই দেখা গেল ভদ্রলোককে। মুখ বিকৃত করে বিশ হাত দূরে একটা ঝোপের পাশ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন আমাদের দিকে। আর সেই সঙ্গে পর্তুগিজ ভাষায় পরিত্রাহি ডেকে চলেছেন ভগবান যিশুকে।

'আমার পায়ে দিয়েছে কামড়, আমি আর নেই'—সন্ডার্সের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন মিঃ লোবো।

কামড়টা মাকড়সার, এবং সেটা ডান পায়ের পাতার ঠিক উপরে। লোবো গিয়েছিলেন একটি ঝোপের ধারে ছোট কাজ সারতে। হাতের সোনার ঘড়ির ব্যান্ডটা নাকি এমনিতেই একটু আলগা ছিল ; সেটা খুলে পড়ে যায় মাটিতে। টর্চ জ্বালিয়ে এ দিক, ও দিক খুঁজতে গিয়ে মাকড়সার গর্তে পা পড়ে। কামড়ে বিষ আছে ঠিকই, তবে মারাত্মক নয়। কিন্তু লোবোর ভাব দেখে সেটা বোঝে কার সাধ্যি।

ওষুধ ছিল আমার সঙ্গে ; সেটা সন্ডার্সের টর্চের আলোতে লাগিয়ে দিচ্ছি ক্ষতের জায়গায়, এমন সময় লোবোর মুখের দিকে চোখ পড়তে একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ করলাম। তাতে আতঙ্ক ও অনুশোচনার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর দৃষ্টি আমারই দিকে।

'কী হয়েছে তোমার ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি পাপ করেছি, আমায় ক্ষমা করো।' কাতর কণ্ঠে প্রায় কান্নার সুরে বলে উঠলেন মিঃ লোবো।

'কী পাপের কথা বলছ তুমি ?'

মিঃ লোবো দু'হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল। সন্ডার্স ও ক্রোল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।

'সেদিন রাত্রে,' বললেন মিঃ লোবো, 'সেদিন রাত্রে প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে প্রদর্শনীতে ঢুকে আমি তোমার গবেষণার নোটসের খাতা বার করে নিয়েছিলাম। তারপর...'

রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, কিন্তু তাও বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।

'তারপর...সেগুলোকে জেরক্স করে আবার যথাস্থানে রেখে দিই।'

এবার আমি প্রশ্ন করলাম। 'তারপর ?'

'তারপর—কপিগুলো—দিয়ে দিই মিঃ ব্লুমগার্টেনকে। তিনি আমায়...টাকা...অনেক টাকা...'

'ঠিক আছে। আর বলতে হবে না।'

মিঃ লোবো একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'কথাটা বলে হালকা লাগছে...অনেকটা—এবার নিশ্চিন্তে মরতে পারব।'

'আপনি মরবেন না, মিঃ লোবো,' শুকনো গলায় বলল সন্ডার্স। 'এ মাকড়সার কামড়ে ঘা হয়, মৃত্যু হয় না।'

মিঃ লোবোর ঘা আমার ওষুধে শুকোবে ঠিকই, কিন্তু তিনি আমার যে ক্ষতিটা করলেন, সেটা অপূরণীয়।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্র এক বর্ণও ভুল বলেননি।
তার মানে কি এল ডোরাডো সত্যিই আছে ?

১৮ই অক্টোবর, রাত দশটা, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া

আমাদের ব্রেজিল সফরের অপ্রত্যাশিত, অবিস্মরণীয় পরিসমাপ্তির কথাটা এই বেলা লিখে ফেলি, কারণ, কাল সকালেই আমরা যে যার দেশে ফিরছি। এটুকু বলতে পারি যে, সন্ডার্সের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের ভিত এই প্রথম দেখলাম একটা বড় রকম ধাক্কা খেল। সে মানতে বাধ্য হয়েছে যে, সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, আখেরে এর ফল ভালই হবে।

এইবার ঘটনায় আসি।

গতকাল সকালে ব্যান্ডেজ বাঁধা লোবোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ক্যানু করে বেরিয়ে পড়লাম চুকাহামাই উপজাতিদের বাসস্থান পোরোরির উদ্দেশে। আমাদের যেতে হবে পঞ্চাশ কিলোমিটার। যত এগোচ্ছি, ততই যেন গাছপালা ফুল পাখি, প্রজাপতির সম্ভার বেড়ে চলেছে। এই স্বপ্নরাজ্যের মনোমুগ্ধকারিতার মধ্যে আতঙ্কের খাদ মিশে আছে বলে এটা যেন আমার কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমি জানি, এ ব্যাপারে সন্ডার্স ও ক্রোল আমার সঙ্গে একমত। তারা যে খরস্রোতা নদীর উপকূলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, তার একটা কারণ বোধ হয় অ্যানাকোন্ডা দর্শনের প্রত্যাশা। এখনও পর্যন্ত সে আশা পূরণ হবার কোনও লক্ষণ দেখছি না। মাইলখানেক যাবার পর আমাদের নৌকা থামাতে হল।

নদীর ধারে তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে ; তারা হাইটরের দিকে হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অচেনা ভাষায় কী যেন বলছে। আমি জানি, এখানকার উপজাতিদের মধ্যে 'গে' নামে একটা ভাষা প্রচলিত আছে, যেটা হাইটর খুব ভালভাবেই জানে।

হাইটর লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ করে বলল, 'এরা স্থানীয় ইন্ডিয়ান। এরা আমাদের পোরোরি যেতে বারণ করছে।'

'কেন ?'—আমরা তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

'এরা বলছে চুকাহামাইরা কী কারণে নাকি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। কালই নাকি একটা জাপানি দল পোরোরি গিয়েছিল ; তাদের দু'জনকে এরা বিষাক্ত তির দিয়ে মেরে ফেলেছে।'

আমি জানি, কুরারি নামে এক সাংঘাতিক বিষ ব্রেজিলের আদিম জাতিরা তাদের তিরের ফলায় মাখিয়ে শিকার করে।

'তা হলে এখন কী করা যায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

হাইটর বলল, 'আপাতত এখানেই ক্যাম্প ফেলা যাক। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি বরং একটা ক্যানু নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে আসি।'

'কিন্তু এই হঠাৎ উত্তেজনার কারণটা কিছু আন্দাজ করতে পারছেন ?' সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

হাইটর বলল, 'আমার একটা ধারণা হচ্ছে, পরশু রাত্রের বিস্ফোরণের সঙ্গে এটা যুক্ত। বড় রকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এরা এখনও সেটাকে দেবতার অভিশাপ মনে করে বিচলিত হয়ে পড়ে।'

অগত্যা নামলাম আমরা ক্যানু থেকে।

জায়গাটা যে ক্যাম্প ফেলার পক্ষে আদর্শ নয়, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। এখানে সাধারণত নদীর পাশে খানিকটা দূর অবধি জঙ্গল গভীর থাকে। ভিতরে কিছুটা অগ্রসর হলে দেখা যায়, বন পাতলা হয়ে এসেছে। এই জায়গাটায় কিন্তু যত দূর অবধি দৃষ্টি যায়, তাতে

অরণ্যের ঘনত্ব হ্রাস পাবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

নদীর দশ-পনেরো গজের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা পেয়ে আমরা সেখানেই বিশ্রামের আয়োজন করলাম। কতক্ষণের অপেক্ষা জানা নেই, তাই তাঁবুও খাটিয়ে ফেলা হল—বিশেষ করে লোবোর জন্য। সে ভালর দিকে যাচ্ছে জেনেও মিনিটে মিনিটে যিশু ও মেরি মাতাকে স্মরণ করছে। হয়তো সেটা এই কারণেই যে, সে অনুমান করছে আমরা শহরে ফিরে গিয়েই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করব। এ আশঙ্কা যদি সে সত্যিই করে থাকে, তবে সেটা ভুল নয়, কারণ আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকলেও, ক্রোল ও সন্ডার্স দু'জনেই লোবোর গর্দান নিতে বদ্ধপরিকর। আর ব্লুমগার্টেনকে পেলে তারা নাকি তার মাংস সিদ্ধ করে ব্রেজিলের নরমাংসভুক উপজাতির সন্ধান করে তাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে। তাদের বিশ্বাস, ব্লুমগার্টেনের মাংসে অন্তত বারো জনের ভূরিভোজ হবে।

আমরা তিনজনেই বেশ ক্লান্ত। পর পর চারটি বড় গাছের গুঁড়িতে তিনটি হ্যামক টাঙিয়ে তিনজনে শুয়ে মৃদু দোল খাচ্ছি, কাছেই বনের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি চুরিয়াঙ্গি পাখির কর্কশ ডাক, এমন সময় সন্ডার্স হঠাৎ একটা গোঙানির মতো শব্দ করে উঠল। আর সেই সঙ্গে আমাদের নৌকার দু'জন মাঝি একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

এই গোঙানি ও চিৎকারের কারণ যে একই, সেটা বুঝতে আমার ও ক্রোলের তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি।

আমাদের থেকে দশ-বারো গজ দূরে একটা দীর্ঘাকার গাছের উপর দিকের একটা ডাল বেয়ে যেন আমাদেরই লক্ষ্য করে নেমে আসছে একটা সাপ, যেমন সাপের বর্ণনা পুরাণ বা রূপকথার বাইরে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

এ সাপের নাম জানি, হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে বিস্ময়ের তাড়নায় নামটা আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসত, কিন্তু এখন দেখলাম গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোনোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আতঙ্কের সঙ্গে একটা ঝিমধরা ভাব, যেটা পরে ক্রোল ও সন্ডার্সকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, তাদেরও হয়েছিল।

ব্রেজিলের এই অতিকায় ময়াল মাটি থেকে প্রায় বিশ হাত উঁচু ডাল থেকে যখন মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থাতে পৌঁছেছে, তখনও তার আরও অর্ধেক নামতে বাকি। তার মানে এর দৈর্ঘ্য ষাট ফুটের কম নয়, আর প্রস্থ এমনই যে, মানুষ দু'হাতে বেড় পাবে না।

আমি এই অবস্থাতেও বুঝতে চেষ্টা করছি আমার মনের ভাবের মধ্যে কতটা বিস্ময় আর কতটা আতঙ্ক, এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনজনকে বেকুব বানিয়ে দিয়ে চোখের সামনে থেকে অ্যানাকোন্ডা প্রবর বেমালুম উধাও।

'আপনাদের আশ মিটেছে তো ?'

আমাদের পিছনে কখন যে একটি ক্যানু এসে দাঁড়িয়েছে এবং কখন যে তার থেকে শ্রীমান নকুড়চন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন, তা জানি না।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ানো একটি সাহেবের দিকে নির্দেশ করে বললেন নকুড়বাবু,—'ইনি হলেন ব্লুমগার্টেন সাহেবের বিমানচালক মিস্টার জো হপগুড। ইনিই সাহেবের হেলিকপ্টারে করে আমাকে নিয়ে এলেন। শুধু শেষের দেড় মাইল পথ আমাদের ডিঙিতে আসতে হয়েছে।'

ক্রোল আর থাকতে না পেরে বলে উঠল—'হি মেড আস সি দ্যাট স্নেক !'

আমি বললাম, 'তোমাকে তো বলেইছিলাম, ওঁর মধ্যে এই ক্ষমতারও একটা আভাস

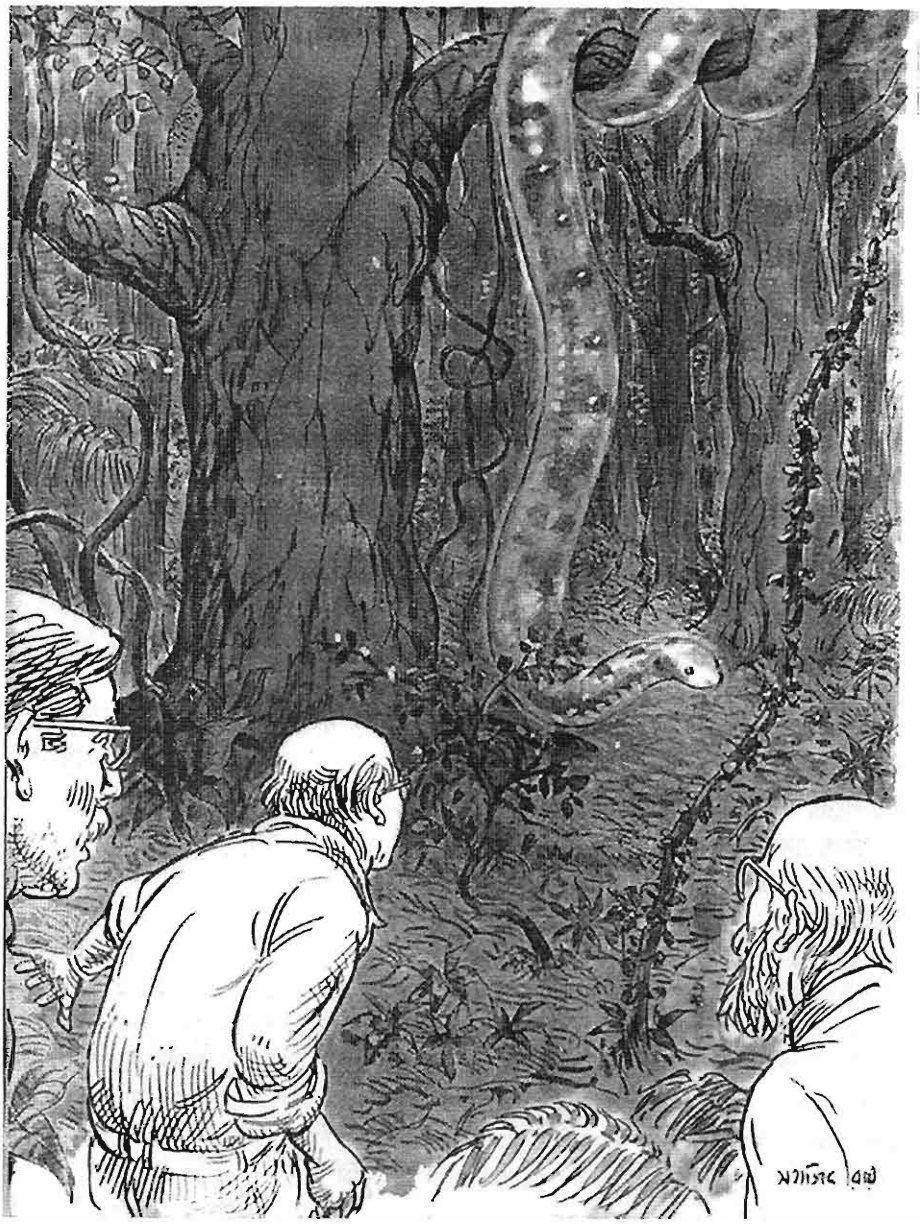

পেয়েছিলাম দেশে থাকতেই।'

'বাট দিস ইজ ইনক্রেডিবল্!'

নকুড়বাবু লজ্জায় লাল। বললেন, 'তিলুবাবু, আপনি দয়া করে এঁদের বুঝিয়ে দিন যে, এতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নেই। এ সবই হল—যিনি আমায় চালাচ্ছেন, তাঁরই খেলা।'

'কিন্তু এল ডোরাডো?'

'সে তো দেখিয়ে দিয়েছি সাহেবকে হেলিকপ্টার থেকেই। যেমন সাপ দেখালুম, সেইভাবেই দেখিয়েছি। বরদা বাঁড়ুজ্যের বইয়েতে কিছু ছবি ছিল, মদন পালের আঁকা। সাপের ছবি, এল ডোরাডোর ছবি, সবই ছিল। বাজে ছবি মশাই। সোনার শহরের বাড়িগুলো দেখতে করেছে টোল খাওয়া টোপরের মতো—তাও সিধে নয়, ট্যারচা। সাহেবও সেই ছবির মতো শহরই দেখলে, আর দেখে বললে, 'এল ডোরাডো ইজ ব্রেথ টেকিং।'

'তারপর?'

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি নকুড়বাবুর কথা।

'তারপর আর কী?—জঙ্গলের মধ্যে শহর। সেখানে হেলিকপ্টার নামবে কী করে? নামলুম জঙ্গলের এ দিকটায়। সাহেব দুই বন্দুকধারীকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন, আর আমি চলে এলুম আমার কথামতো আপনাদের মিট করব বলে। আমি জানি, আপনারা কী ভাবছেন—হপগুডসাহেব আমাকে আনতে রাজি হলেন কেন। এই তো? ব্লুমগার্টেনসাহেবের সঙ্গে চুক্তি ছিল, উনি এল ডোরাডো চাক্ষুষ দেখলেই আমার হাতে তুলে দেবেন নগদ পাঁচ হাজার ডলার। হপগুডকে বলে রেখেছিলুম, ওকে আড়াই দেব যদি ও আমাকে পৌঁছে দেয় আপনাদের কাছে। দেখুন কীরকম কথা রেখেছেন সাহেব—মনটা কীরকম দরাজ, ভেবে দেখুন। আর, ও হ্যাঁ—এল ডোরাডো দেখা গেলে ব্লুমগার্টেনসাহেব এটাও কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি আপনার গবেষণার কাগজপত্তরের কপি ফেরত দেবেন। এই নিন সেই কাগজ।'

নকুড়বাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে রাবার ব্যান্ডে বাঁধা এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি এত মুহ্যমান যে, মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। এর পরের প্রশ্নটা ক্রোলই করল—

'কিন্তু ব্লুমগার্টেন যখন দেখবে এল ডোরাডো নেই, তখন কী হবে?'

প্রশ্নটা শুনে নকুড়বাবুর অট্টহাসিতে আশেপাশের গাছ থেকে খানতিনেক ম্যাকাও উড়ে পালিয়ে গেল।

'ব্লুমগার্টেন কোথায়?' কোনওমতে হাসি থামিয়ে বললেন নকুড় বিশ্বাস।—'তিনি কি আর ইহজগতে আছেন? তিনি জঙ্গলে ঢোকেন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তার ছ' ঘণ্টা পরে, রাত এগারোটা তেত্রিশ মিনিটে, এল ডোরাডোয় উল্কাপাতের ফলে সাড়ে তিন মাইল জুড়ে একটি গোটা জঙ্গল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ ঘটনাও যে আপনাদের আশীর্বাদে আগে থেকেই জানা ছিল, তিলুবাবু! আপনার মতো এমন একজন লোক, যাঁর সঙ্গ পেয়ে আজ আমি তিনশো টাকা দামের একটি বিলিতি ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে পারছি আমার ঠাকুমার জন্য, তাঁর শত্রুর কি আর শেষ রাখতে পারি আমি?'

ব্রাসিলিয়ায় এসেই দেখেছি, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে কুইয়াবা—সান্তেরাম হাইওয়ের ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি গভীর অরণ্যে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টন ওজনের একটি উল্কাপাতের খবর।

সৌভাগ্যক্রমে এই অঞ্চলে কোনও মানুষের বাস ছিল না। জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদি যা ছিল, তা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৭

শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান

প্রিয় শঙ্কু,

আমার দলের একটি লোকের কালাজ্বর হয়েছে তাই তাকে নাইরোবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার হাতেই চিঠি যাচ্ছে, সে ডাকে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করবে। এই চিঠি কেন লিখছি সেটা পড়েই বুঝতে পারবে। খবরটা তোমাকে না দিয়ে পারলাম না। সবাই কথাটা বিশ্বাস করবে না ; বিজ্ঞানীরা তো নয়ই। তোমার মনটা খোলা, নানা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে, তাই তোমাকেই বলছি।

মোকেলে-ম্‌বেম্বে কথাটা তোমার চেনা কি ? বোধ হয় না, কারণ আমি কঙ্গো এসেই কথাটা প্রথম শুনছি। স্থানীয় লোকেরা বলে মোকেলে-ম্‌বেম্বে নাকি একরকম অতিকায় জানোয়ার। বর্ণনা শুনে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের কথাই মনে হয়। কঙ্গোর অরণ্যে নাকি এ জানোয়ারকে দেখা গেছে। কথাটা প্রথমে যখন শুনি তখন স্বভাবতই আমার কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু মাসখানেক থাকার পরও যখন সে প্রাণীর দেখা পেলাম না, তখন সে নিয়ে আর চিন্তা করিনি। তিনদিন আগে একটি অতিকায় প্রাণীর পায়ের ছাপ আমি দেখেছি লিপু নদীর ধারে। এ পা আমাদের কোনও চেনা জানোয়ারের নয়। ছাপের আয়তন দেখে প্রাণীটিকে বিশাল বলেই মনে হয়—অন্তত হাতির সমান তো বটেই। তবে আসল জানোয়ারের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আশা আছে, কিছুদিনের মধ্যেই পাব। সম্ভব হলে তোমায় জানাব।

আমি এখন রয়েছি ভিরুঙ্গা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে কঙ্গোর অরণ্যের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। আমার বিশ্বাস এখানে এর আগে সভ্য জগতের কোনও প্রাণীর পা পড়েনি। তোমার অভাব তীব্রভাবে বোধ করছি। পারলে একবার এ অঞ্চলটায় এসো। এই আদিম অরণ্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের কবি ট্যাগোর হয়তো পারতেন। গীতাঞ্জলি এখনও আমার চিরসঙ্গী।

সেই ইটালিয়ান দলের কোনও হদিস পাইনি এ পর্যন্ত। স্থানীয় লোকে বলছে, সে দল নাকি মোকেলে-ম্‌বেম্বের শিকারে পরিণত হয়েছে।

আশা করি ভাল আছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ক্রিস ম্যাকফারসন

ভূতাত্ত্বিক ও খনিবিশারদ ক্রিস্টোফার ম্যাকফারসনের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ইংল্যান্ডে বছরতিনেক আগে। আমি তখন আমার বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের অতিথি হয়ে সাসেক্সে বিশ্রাম করছি। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ম্যাকফারসন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তার হাতে ছিল এক কপি ইংরাজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ। ভিতরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই সই। ম্যাকফারসনের বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার। তিনি নিজে কবিকে দিয়ে এই বইয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। ট্যাগোরের প্রতি বাপের ভক্তি এখন ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আমি তাকে আরও তিনখানা রবীন্দ্রনাথের বই কিনে দিই।

তারপর দেশে ফিরেও ম্যাকফারসনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পেয়েছি। সে যে কঙ্গো যাচ্ছে সে খবরও সে দিয়েছিল। এখন ভয় হচ্ছে, গত বছর প্রোফেসর সানতিনির নেতৃত্বে যে ইটালিয়ান দলটি কঙ্গোর জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে যায়, ম্যাকফারসনের দলেরও হয়তো সেই দশাই হয়েছে। কারণ চার মাস আগে এই চিঠি পাবার পর আজ অবধি ম্যাকফারসনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যে আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যাকফারসনের দল কঙ্গো গিয়েছিল, তারাও কোনও খবর পায়নি। অথচ রেডিয়ো মারফত এদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

এই নিয়ে পর পর তিনটি দল উধাও হল কঙ্গোর জঙ্গলে। দু' বছর আগে একটি জার্মান দলেরও এই দশা হয়। এদের কয়েকজনকে আমি চিনি। দলপতি প্রোফেসর কার্ল হাইমেনডর্ফের সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছরসাতেক আগে। বহুমুখী প্রতিভা এই বিজ্ঞানীর। একাধারে ভূতাত্ত্বিক, পদার্থবিদ, ভাষাবিদ ও দুঃসাহসী পর্যটক। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও দৈহিক শক্তি প্রচণ্ড। একবার এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে এক সতীর্থের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় হাইমেনডর্ফ এক ঘুষিতে তাঁর চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলেন।

এই দলে ছিলেন আরও তিনজন। তার মধ্যে ইলেকট্রনিকসে দিকপাল প্রোফেসর এরলিখ ও ইনভেন্টর পদার্থবিদ রুডলফ গাউস আমার পরিচিত। চতুর্থ ব্যক্তি এনজিনিয়র গটফ্রীড হাল্‌সমানকে আমি দেখিনি কখনও।

এই দলটিও নিখোঁজ হয়ে যায় চার মাসের মধ্যেই।

ম্যাকফারসনের চিঠিটা পাবার পর থেকেই কঙ্গোর আদিম অরণ্য আমার মনকে বিশেষভাবে টানছে। কী রহস্য লুকিয়ে আছে ওই অরণ্যে কে জানে! মোকেলে-ম্‌বেম্বের ব্যাপারটাই বা কতটা সত্যি? প্রায় দেড়শো কোটি বছর ধরে জীবজগতে রাজত্ব করার পর আজ থেকে ৭০ কোটি বছর আগে ডাইনোসর শ্রেণীর জানোয়ার হঠাৎ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়। এই ঘটনার কোনও কারণ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাননি। উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশী, দুই রকম জানোয়ারই ছিল এদের মধ্যে। পৃথিবীর কোনও অজ্ঞাত অংশে কি তারা এখনও বেঁচে আছে? যদি কঙ্গোর অরণ্যে থেকে থাকে, তা হলে তাদের উদ্দেশে ধাওয়া করাটা কি খুব অন্যায় হবে?

দিন পনেরো আগে কঙ্গো যাবার প্রস্তাব দিয়ে আমার দুই বন্ধু সন্ডার্স ও ক্রোলকে চিঠি লিখি। উদ্দেশ্য ম্যাকফারসনের দলের খোঁজ করা। সন্ডার্স জানায় যে, আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সংস্থার কর্তা লর্ড কানিংহ্যামের সঙ্গে তার যথেষ্ট আলাপ আছে। কঙ্গো অভিযান সম্পর্কে সন্ডার্স সবিশেষ আগ্রহী ; শুধু খরচটা যদি সংস্থা জোগায়, তা হলে আর কোনও ভাবনা থাকে না।

ক্রোলের যে উৎসাহ হবে, সেটা আগে থেকেই জানতাম। যেমন জীবজন্তু, তেমনই খনিজ সম্পদে কঙ্গোর তুলনা মেলা ভার। একদিকে হাতি সিংহ হিপো লেপার্ড গোরিলা শিম্পাঞ্জি ; অন্যদিকে সোনা হিরে ইউরেনিয়াম রেডিয়াম কোবল্ট প্ল্যাটিনাম তামা।

কিন্তু ক্রোলের লক্ষ্য সেদিকে নয়। সে বেশ কয়েক বছর থেকেই ঝুঁকেছে অতিপ্রাকৃতের দিকে। তা ছাড়া নানান দেশের মন্ত্রতন্ত্র ভেলকি ভোজবাজির সঙ্গে সে পরিচিত। এ সবের সন্ধানে সে আমার সঙ্গে তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছে। নিজে গত বছরে হিপ্নোটিজম অভ্যাস করে সে ব্যাপারে রীতিমতো পারদর্শী হয়ে উঠেছে। আফ্রিকাতে এসব জিনিসের অভাব নেই, কাজেই ক্রোলের আগ্রহ স্বাভাবিক।

অর্থাৎ আমরা তিনজনেই কোমর বেঁধে তৈরি আছি। এখন ভৌগোলিক সংস্থার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা। এই সংস্থাই ম্যাকফারসনের দলের খরচ জুগিয়েছিল। আমাদের একটা

প্রধান উদ্দেশ্য হবে, সেই দলের অনুসন্ধান করা। সুতরাং সে কাজে সংস্থার খরচ না দেবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

২১শে এপ্রিল

সুখবর। আজ টেলিগ্রাম পেয়েছি। ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ফাউন্ডেশন আমাদের অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করতে রাজি। সন্ডার্স কাজের কাজ করেছে। আমরা ঠিক করেছি, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ব।

২৯শে এপ্রিল

আমাদের দলে আরেকজন যোগ দিচ্ছে। একজন নয়, দুজন। ডেভিড মানরো ও তার গ্রেট ডেন কুকুর রকেট।

যার নামে মানরো দ্বীপ, যেখানে আমাদের লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কথা আমি আগেই বলেছি, সেই হেকটর মানরোর বংশধর তরুণ ডেভিড মানরো তার কুকুর সমেত আমাদের অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। কবিভাবাপন্ন এই যুবকটি অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাগল। পড়াশুনা আছে বিস্তর, এবং বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, যথেষ্ট সাহস ও দৈহিক শক্তি রাখে সে। সন্ডার্সের কাছে খবরটা পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আফ্রিকার জঙ্গল—বিশেষ করে কঙ্গোর ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট সম্বন্ধে সে নাকি প্রচুর পড়াশুনা করেছে। তাকে সঙ্গে না নিলে নাকি তার জীবনই বৃথা হবে। এ ক্ষেত্রে না করার কোনও কারণ দেখিনি।

আমরা সকলে নাইরোবিতে জমায়েত হচ্ছি। সেখানেই স্থির হবে কীভাবে কোথায় যাওয়া।

৭ই মে

আজ সকালে আমরা নাইরোবিতে এসে পৌঁছেছি।

আমাদের হোটেলটা যেখানে, তার চারিপাশে আদিম আফ্রিকার কোনও চিহ্ন নেই। ছিমছাম সমৃদ্ধ আধুনিক শহর, ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট দোকানপাট সব কিছুতেই পশ্চিমি আধুনিকতার ছাপ। অথচ জানি যে, পাঁচ মাইলের মধ্যেই রয়েছে খোলা প্রান্তর—যাকে এখানে বলে সাভানা—যেখানে অবাধে চরে বেড়াচ্ছে নানান জাতের জন্তু জানোয়ার। এই সাভানার দক্ষিণে রয়েছে তুষারাবৃত মাউন্ট কিলিমানজারো।

এখানে জিম ম্যাহোনির পরিচয় দেওয়া দরকার। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের আয়ারল্যান্ডের এই সন্তানটির রোদে-পোড়া গায়ের রং আর পাকানো চেহারা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ হচ্ছে যাকে বলে একজন হোয়াইট হান্টার। শিকার হল এর পেশা। আফ্রিকার জঙ্গলে অভিযান চালাতে গেলে একজন হোয়াইট হান্টার ছাড়া চলে না। স্থানীয় ভাষাগুলি এঁদের সড়গড়, অরণ্যের মেজাজ ও জলহাওয়া সম্বন্ধে এঁরা ওয়াকিবহাল, আর হিংস্র জন্তু জানোয়ার থেকে আত্মরক্ষার উপায় এঁদের জানা। ম্যাহোনিই আমাদের জিনিসপত্র বইবার জন্য কিকুউয়ু উপজাতীয় ছ'জন কুলির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

হোটেলের কফি-শপে বসে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। তিন-তিনটে অভিযাত্রীদল পর

পর উধাও হয়ে গেল, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ম্যাহোনি তার পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কঙ্গোর জঙ্গলে যে কত রকম বিপদ লুকিয়ে আছে, তার ফিরিস্তি আর কী দেব তোমাদের। জঙ্গলের গা ঘেঁষে পুব দিকে রয়েছে পর পর সব আগ্নেয়গিরি। মুকেঙ্কু, মুকুবু, কানাগোরাউই। রোয়ান্ডা ছাড়িয়ে কিভু হ্রদ পেরোলেই এই সব আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে জঙ্গল শুরু। বড় রকম অগ্ন্যুৎপাতের কথা সম্প্রতি শোনা যায়নি বটে, কিন্তু হঠাৎ কখন এগুলো জেগে উঠবে, তা কে বলতে পারে ? তা ছাড়া ওই সব অঞ্চলে নরখাদক ক্যানিবলসের অভাব নেই। তার উপর অরণ্যের স্বাভাবিক বিপদগুলোর কথাও তো ভাবতে হবে। শুধু হিংস্র জানোয়ার নয়, মারাত্মক ব্যারামও হতে পারে কঙ্গোর জঙ্গলে। কথা হচ্ছে, তোমরা কোথায় যেতে চাও তার ওপর কিছুটা নির্ভর করছে।'

উত্তরটা সন্ডার্স দিল।

'আমরা যে হারানো দলটার খোঁজ করতে যাচ্ছি, তাদের একজন মাস চারেক আগে কালাজ্বর হয়ে এখানে হাসপাতালে চলে আসে। সে অবিশ্যি কিছুদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে ফিরে যায় ; কিন্তু আমরা হাসপাতাল থেকে খবর নিয়েছি যে, দলটা মুকেঙ্কু আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাচ্ছিল।'

'তোমরাও সেই দিকেই যেতে চাও ?'

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি ?'

'বেশ। তবে সেখানে পৌঁছতে হলে তোমাদের পায়ে হাঁটতে হবে প্রায় দেড়শো মাইল, কারণ হেলিকপ্টার শেষ অবধি যাবে না। ল্যান্ডিং-এর জন্য খোলা সমতল জায়গা পাবে না।'

ভৌগোলিক সংস্থা আমাদের জন্য দুটো বড় হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একটাতে আমরা যাব, আরেকটায় কুলি আর মাল।

মানরো কিছুক্ষণ থেকেই উশখুশ করছিল, এবারে তার প্রশ্নটা করে ফেলল।

'মোকেলে-ম্‌বেম্বের কথা জান তুমি ?'

ম্যাহোনি আমাদের চমকে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠল।

'এ সব গল্প কোথায় শোনা ?'

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, সম্প্রতি একাধিক পত্রিকায় কঙ্গো সম্বন্ধে প্রবন্ধে আমি এই অতিকায় জানোয়ারের কথা পড়েছি।

'ও সব আষাঢ়ে গল্পে কান দিয়ো না,' বলল ম্যাহোনি। 'এদের কিংবদন্তিগুলির বয়স যে ক' হাজার বছর, তার কোনও হিসেব নেই। আমি আজ সাতাশ বছর ধরে আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরছি, চেনা জানোয়ারের বাইরে একটি জানোয়ারও কখনও দেখিনি।'

মানরো বলল, 'কিন্তু আমি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি পাদরিদের লেখা বিবরণ নিজে পড়েছি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। তারা আফ্রিকার জঙ্গলে অতিকায় জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখেছে। হাতির পায়ের মতো বড়, কিন্তু হাতি না।'

'সেরকম আরও জানোয়ারের কথা শুনবে,' বলল ম্যাহোনি। 'কাকুন্ডাকারির নাম শুনেছ ? হিমালয়ে যেমন ইয়েতি বা তুষারমানব, আফ্রিকার জঙ্গলে তেমনই কাকুন্ডাকারি। দু'পায়ে হাঁটা লোমশ জানোয়ার, গোরিলার চেয়েও বেশি লম্বা। এও সাতাশ বছর ধরে শুনে আসছি, কিন্তু কেউ চোখে দেখেছে বলে শুনিনি। তবে হ্যাঁ—যেটা এই সব অঞ্চলে আছে, কিন্তু কোথায় আছে তা জানা যায়নি, তেমন একটা জিনিস আমার কাছেই আছে।'

ম্যাহোনি তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি জিনিস বার করে সামনের টেবিলে কফির পেয়ালার পাশে রাখল। মুঠো ভরে যায় এমন সাইজের একটি স্বচ্ছ পাথর।

'নীল শিরাগুলি লক্ষ করো।' বলল ম্যাহোনি।

'এটা কি ব্লু ডায়মন্ড ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' বলল ম্যাহোনি, 'প্রায় সাতশো ক্যারেট। এটাও এই কঙ্গোর জঙ্গলেই পাওয়া যায়। সম্ভবত যেদিকে আমরা যাব, মোটামুটি সেই দিকেই। এক পিগমি পরিবারের সঙ্গে বসে ভোজ করছিলাম। তাদেরই একজন এটা আমাকে দেখায়। দু' প্যাকেট সিগারেটের বদলে সে এটা আমাকে দিয়ে দেয়।'

'এর তো আকাশ ছোঁয়া দাম হওয়া উচিত।' পাথরটা হাতে নিয়ে সসম্ভ্রমে বলল ডেভিড মানরো।

আমি বললাম, 'ঠিক তা নয়। রত্ন হিসেবে ব্লু ডায়মন্ডের দাম বেশি নয়। তবে কোথায় যেন পড়েছি, ইলেকট্রনিকসের ব্যাপারে এর চাহিদা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে।'

আমরা সকলে পালা করে হীরকখণ্ডটা দেখে আবার ম্যাহোনিকে ফেরত দিয়ে দিলাম।

৮ই মে, রাত সাড়ে দশটা

কঙ্গোর আদিম অরণ্যের ঠিক বাইরে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় ক্যাম্প ফেলেছি আমরা। আমারই আবিষ্কার শ্যাঙ্কলন প্লাস্টিকের তাঁবু, হালকা অথচ মজবুত। সবসুদ্ধ পাঁচটা তাঁবু। তার তিনটেতে আমরা পাঁচজন ভাগাভাগি করে রয়েছি ; আমি আর ডেভিড একটায়, ক্রোল ও সন্ডার্স আরেকটায় আর তৃতীয়টায় জিম ম্যাহোনি। বাকি দুটোয় রয়েছে কুলির দল। মশারির ভিতরে বসে লিখছি। মশার উপদ্রব সব সময়ই। তবে আমার কাছে আমারই তৈরি সর্বরোগনাশক মিরাকিউরল বড়ি আছে, তাই ব্যারামের ভয় করি না। আসল জঙ্গলে কাল প্রবেশ করব। তার আগে আজকের ঘটনাগুলো লিখে রাখি।

সকাল আটটায় নাইরোবি থেকে হেলিকপ্টারে রওনা দিয়ে কেনিয়া ছেড়ে রোয়ান্ডায় এসে রাওয়ামাগেমা এয়ারফিল্ডে নেমে আমাদের তেল নিতে হল। তারপর কিভু হ্রদ পেরিয়ে আধ ঘণ্টা চলার পর একটা খোলা জায়গায় নেমে আমরা উত্তরমুখী হাঁটতে শুরু করলাম। আকাশ থেকেই দেখেছিলাম, গভীর অরণ্য সবুজ পশমের গালিচার মতো ছড়িয়ে রয়েছে

আমাদের পশ্চিমে আর উত্তরে। যত দূর দৃষ্টি যায় সবুজের মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। এই ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের বিস্তৃতি দু' হাজার মাইল। তার অনেক অংশেই সভ্য মানুষের পা পড়েনি কখনও।

হেলিকপ্টার আমাদের নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল। নাইরোবির সঙ্গে রেডিয়োর যোগাযোগ থাকবে আমাদের। অভিযানের শেষে আবার হেলিকপ্টার এসে আমাদের নিয়ে যাবে। এক মাসের মতো খাবারদাবার আছে আমাদের সঙ্গে।

যেখানে নামলাম, সেখান থেকে উত্তরে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি, আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গগুলো গাছপালার উপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। এইসব পাহাড়ের গায়ে পার্বত্য গোরিলার বাস। আমরা রয়েছি উপত্যকায়। এর উচ্চতা হাজার ফুটের উপর। এ অঞ্চলে হাতি, হিপো, লেপার্ড, বানর শ্রেণীর নানান জানোয়ার, ওকাপি, প্যাঙ্গোলিন, কুমির ও অন্যান্য সরীসৃপ—সবই পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই অনেক অপরিসর নদী বয়ে গেছে, কিন্তু সেগুলো এতই খরস্রোতা যে, নদীপথে যাতায়াত খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের তাই পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই।

সাড়ে দশটায় চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা রওনা দিলাম। আমাদের যেতে হবে উত্তরে, খানিকটা পথ উঠতে হবে পাহাড়ের গা দিয়ে, তারপর নেমে প্রবেশ করব আসল গভীর জঙ্গলে। এখানে জঙ্গল তেমন গভীর নয়, উপরে চাইলে আকাশ দেখা যায়। গাছের মধ্যে মেহগনি, টিক আর আবলুশই প্রধান, মাঝে মধ্যে এক-আধটা বাঁশঝাড়, আর সর্বত্রই রয়েছে লতা জাতীয় গাছ। হিংস্র জানোয়ারের অতর্কিত আবির্ভাবের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। ম্যাহোনির হাতে একটা দোনলা বন্দুক, ক্রোল ও কুলিসর্দার কাহিন্দির হাতে একটা করে রাইফেল। কাহিন্দি লোকটি বেশ। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে, নিজের ভাষা সোয়াহিলি। আমিও যে সোয়াহিলি জানি, সেটা কাহিন্দির কাছে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। বেশ মজার এই সোয়াহিলি ভাষাটা। এরা বলে 'চায় তৈয়ারি'—অর্থাৎ চা প্রস্তুত। আসলে যেমন বাংলায়, তেমনি সোয়াহিলিতে, বেশ কিছু আরবি, ফারসি, হিন্দি, পোর্তুগিজ কথা মিশে গেছে।

সিঙ্গল ফাইলে চলেছি আমরা সকলে, সবার আগে জিম ম্যাহোনি। আমাদের চারজনের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। যে ইটালিয়ান দলটি হারিয়ে গেছে, তাদের কাউকেই আমরা চিনতাম না, কিন্তু হাইমেনডর্ফকে ক্রোল বেশ ভাল ভাবেই চিনত, আর ক্রিস ম্যাকফারসনের সঙ্গে তো সন্ডার্সের অনেক দিনের পরিচয়। একমাত্র ডেভিড মানরো আমাদের ছাড়া কাউকেই চেনে না, কিন্তু তার উৎসাহ আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। লিভিংস্টোন যে পথে গেছে, স্ট্যানলি, মাঙ্গো পার্ক যে পথে গেছে, সে পথে সেও চলেছে—এটা ভাবতেই যে তার রোমাঞ্চ হচ্ছে, সে কথা সে একাধিকবার বলেছে আমাদের। রকেটকে আগে যখন দেখেছি তখনও সে আশ্চর্য শিক্ষিত কুকুর ছিল। কিন্তু এবার যেন দেখছি আরও বেড়েছে তার বুদ্ধি আর আনুগত্য। জন্তু জানোয়ার যে এক-আধটা চোখে পড়ছে না তা নয়—গাছের ডালে বাঁদর তো প্রায়ই দেখা যাচ্ছে,—কিন্তু সে সম্বন্ধে রকেট সম্পূর্ণ উদাসীন। দৃষ্টি যদি বা একবার সেদিকে যায়, হাঁটা থামানোর কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ঘণ্টাখানেক চলার পর হঠাৎ দেখলাম ম্যাহোনি হাঁটা বন্ধ করে তার ডান হাতটা উপরে তুলে আমাদেরও থামতে বলল। কুলি সমেত সকলেই থামল, কেবল কাহিন্দি এগিয়ে গিয়ে ম্যাহোনির পাশে দাঁড়াল।

আমাদের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, তারপর প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ঝোপ আর

গাছের পিছনে দেখতে পাচ্ছি, একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠছে। গাছের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি প্রাণীর চলাফেরাও যেন দেখা যাচ্ছে। জানোয়ার নয়, মানুষ।

'কিগানি ক্যানিবলস,' চাপা ফিসফিসে গলায় বলল ম্যাহোনি। 'টেক কাভার বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ।'

ম্যাহোনি তার বন্দুকের সেফটি-ক্যাচটা নামিয়ে নিয়েছে, সেটা একটা 'খুট' শব্দ থেকেই বুঝেছি। কাহিন্দির হাতের বন্দুকও তৈরি। ক্রোল কী করছে সেটা আর পিছন ফিরে দেখলাম না। আমরা চারজনে এবং ছ'জন কুলি, ছড়িয়ে পড়ে এক-একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বনে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রায় দশ মিনিট এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমে অদৃশ্য হল। এবারে কিছু ঘটবে কি ?

হ্যাঁ, ঘটল। ঝোপ আর গাছের পিছন থেকে একদল কৃষ্ণাঙ্গ বেরিয়ে এল। তাদের হাতে তির ধনুক, গায়ে সাদা রঙের ডোরা, চোখের কোটর আর ঠোঁট বাদ দিয়ে সারা মুখ জুড়ে ধবধবে সাদা রঙের প্রলেপ। দেখলে মনে হয়, ধড়ের উপর একটা মড়ার খুলি বসানো। নরখাদক। কথাটা ভাবতেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। আড়চোখে ডাইনে চেয়ে দেখলাম, ডেভিড থরথর করে কাঁপছে, তার বিস্ফারিত দৃষ্টি দলটার দিকে নিবদ্ধ। বেশ বুঝলাম কাঁপুনি আতঙ্কের নয়, উত্তেজনার।

নরখাদকের দল এগিয়ে এসেছে আমাদের দিকে। লক্ষ করলাম ম্যাহোনির বন্দুক এখনও নামানো রয়েছে। কাহিন্দিরও।

লোকগুলো এই দুজনকে দেখল, এবং দেখে থামল।

তারপর তাদের দৃষ্টি ঘুরল এদিক ওদিক। আমাদেরও দেখেছে। এ গাছের গুঁড়ি তেমন প্রশস্ত নয় যে, আমাদের সম্পূর্ণ আড়াল করবে।

সমস্ত বনটা যেন শ্বাসরোধ করে রয়েছে। আমি নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

প্রায় এক মিনিট এইভাবে থাকার পর নরখাদকের দল মৃদুমন্দ গতিতে আমাদের পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখ খুলল প্রথমে ডেভিড মানরো।

'বাট দে ডিড্‌নট ইট আস !'

ম্যাহোনি হেসে উঠল। 'খাবে কেন ? তোমার যদি পেট ভরা থাকে, তা হলে তোমার সামনে এক প্লেট মাংস এনে রাখলে খাবে কি ?'

'ওরা খেয়ে এল বুঝি ?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

'মানুষের মাংস ?'

'সেটা আর একটু এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারব।'

আমরা আবার রওনা দিলাম। ঝোপঝাড় গাছপালা পেরোতেই আরেকটা খোলা জায়গায় পৌঁছোলাম। বাঁয়ে একটা পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। ম্যাহোনি বলল, সেটা চাষির কুটির। এ অঞ্চলে চাষ হয়, সেটা আসার সময় ভুট্টার ক্ষেত দেখে জেনেছি। কুটিরে জনমানব নেই সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

'ওই দ্যাখো,' অঙ্গুলি নির্দেশ করল ম্যাহোনি।

ডাইনে কিছু দূরে একটা নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে রক্তমাখা হাড়। সেগুলো যে মানুষের সেটা আর বলে দিতে হয় না।

'কিগানিদের বাসস্থান আমরা পিছনে ফেলে এসেছি,' বলল ম্যাহোনি। 'এরা আহার সংগ্রহ

করতেই বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু এই ধরনের অসভ্যতা এখনও রয়েছে আফ্রিকায় ?' প্রশ্ন করল সন্ডার্স।

ম্যাহোনি বলল, 'সরকার এদের অভ্যেস পরিবর্তন করানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়নি। অবিশ্যি আমি নিজে এদের অসভ্য বলতে রাজি নই। এইটেই বলা যায় যে, এদের খাদ্যের রুচিটা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু অন্য রকম। ক্যানিবলিজম বহু জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায়। আর মানুষের মাংস শুনেছি অতি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। এরা রংটং মেখে ওইরকম চেহারা করে বেড়ায়, তাই ; আসলে এদের সম্বন্ধে যে 'পৈশাচিক' কথাটা ব্যবহার করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এরা হাসতে জানে, ফুর্তি করতে জানে, পরোপকার করতে জানে।'

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা একটা ক্যাম্পের উপযোগী জায়গায় পৌঁছোলাম। পরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কাল আমরা মুকেঙ্কু আগ্নেয়গিরির পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে যাব আসল অরণ্যের দিকে।

৯ই মে, রাত ন'টা

আজকের দিনটা ক্যাম্পেই কাটাতে হল, কারণ সারাদিন বৃষ্টি। বিকেলের দিকে একবার বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল, তখন ক্যাম্পের কাছে একদল বান্টুর আগমন হয়। এই বিশেষ উপজাতিটি সারা কঙ্গোর অরণ্যে ছড়িয়ে আছে। এদের সঙ্গে একটি ওঝা বা উইচ ডক্টর ছিল। ম্যাহোনির সাহায্যে ক্রোল তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে। আফ্রিকার উইচ ডক্টররা অনেক সময় ভবিষ্যদ্‌বাণী করে। ওঝামশাই আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, আমাদের নাকি চরম বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। লাল মানুষকে যেন আমরা বিশ্বাস না করি। এই বিপদ থেকে নাকি আমরা মুক্তি পাব একটি নতুন-ওঠা চাঁদের রঙের গোলকের সাহায্যে। আমাদের মঙ্গলের জন্য ওঝা পাঁচটি হাতির ল্যাজের চুল রেখে গেছে। সেগুলো আমাদের কবজিতে পেঁচিয়ে পরতে হবে।

ক্রোল সারা সন্ধে ওঝার কথার মানে বার করার চেষ্টায় কাটিয়েছে।

১০ই মে, রাত দশটা

আজ মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

ক্রিস ম্যাকফারসন যে আর ইহজগতে নেই, তার প্রমাণ আজ পেয়েছি। আজকের দিনটা ঘটনাবহুল ও বিভীষিকাময়, তাই সব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করতে হবে। কী অদ্ভুত এক রাজ্যে যে এসে পড়েছি, সেটা এখনও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের কিকুইয়ু কুলিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করছি। ভয় হয়, তারা বুঝি আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাবে। কাহিন্দি তাদের অনেক করে বুঝিয়েছে। তাতে ফল হলেই রক্ষে।

আজ দিনটা ভাল ছিল, তাই ভোর থাকতে রওনা হয়ে আটটার মধ্যে আমরা মুকেঙ্কুর পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। এখানকার মাটিতে ভলক্যানিক অ্যাশ অতীতের অগ্ন্যুৎপাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অনেকবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে এ সব আগ্নেয়গিরিতে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঠে তিনটে নাগাদ আমরা টিনের মাংস, মাছ, চিজ, রুটি ও কফি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারলাম।

আমাদের নীচেই পশ্চিমে বিছানো রয়েছে কঙ্গোর আদিম অরণ্য। ঘন সবুজের এমন সমারোহ এর আগে কখনও দেখিনি। এই উচ্চতায় গরম নেই, কিন্তু জানি, যত নীচে নামব ততই গরম বাড়বে, আর তার সঙ্গে একটা ভ্যাপসা ভাব। মেঘ করে আছে, পথে অল্পস্বল্প বৃষ্টিও পেয়েছি কয়েক বার।

হাজার খানেক ফুট নীচে নামার পর আমরা প্রথম গোরিলার সাক্ষাৎ পেলাম। আমাদের পথ থেকে দশ-পঁচিশ গজ ডাইনে গাছপালা-লতাগুল্মে ঘেরা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে খানদশেক ছোট-বড় গোরিলা। স্বাভাবিক পরিবেশে গোরিলা দেখার অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে, তবু অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও না থেমে পারলাম না।

ক্রোলের হাতে বন্দুক আপনিই উঠতে শুরু করেছে দেখে ম্যাহোনি তাকে চাপা গলায় ধমক দিল—

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? একটা বন্দুক দিয়ে তুমি অতগুলো গোরিলাকে মারবে? নামাও ওটা!'

ক্রোলের হাত নেমে এল।

গোরিলাগুলো আমাদের দেখেছে। তাদের মধ্যে একটি—বোধ হয় পালের গোদা—দল ছেড়ে আমাদের দিকে খানিকদূর এগিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু' হাত দিয়ে বুকের উপর অত্যন্ত দ্রুত চাপড় মেরে দামামার মতো শব্দ করল। এর মানে আর কিছুই না—এটা আমাদের এলাকা, তোমরা এ দিকে এসো না। গোরিলা যে অযথা মানুষকে আক্রমণ করে না, সেটা আমাদের সকলেরই জানা।

কিন্তু আমরা জানলে কী হবে, কুকুর তো জানে না! রকেটের রোখ চেপে গেছে। সে এক হুংকার ছেড়ে এক লাফে এগিয়ে গেছে গোরিলার দিকে। ডেভিডের হাতে চেন, কিন্তু কুকুরের দাপানিতে সে প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পরে আর কী। আর সেই মুহূর্তে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর ব্যাপার।

গোরিলাটা হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে কর্কশ হুংকার ছেড়ে ধেয়ে এল আমাদের দিকে।

সংকটের মুহূর্তে চিরকালই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কাজ করে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। আমাদের দলের তিনটি বন্দুকের একটিও উঁচিয়ে ওঠবার আগেই আমি বিদ্যুদ্বেগে আমার কোটের পকেট থেকে অ্যানাইহিলিনটা বার করে গোরিলার দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিয়েছি। পরমুহূর্তেই গোরিলা উধাও।

ম্যাহোনি বা কাহিন্দি কেউই আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রের কথাটা জানত না; কাজেই তারা যে একেবারে হকচকিয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

'হোয়া—হোয়াট ডিড ইউ ডু?' হতভম্বের মতো জিজ্ঞেস করে উঠল ম্যাহোনি।

জবাবটা দিল ক্রোল।

'ওটা প্রোফেসর শঙ্কুর অনেক আশ্চর্য আবিষ্কারের একটা। আত্মরক্ষার জন্য সামান্য একটি অস্ত্র।'

কাহিন্দির মুখও হাঁ হয়ে গেছে। ম্যাহোনি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে। আমি বললাম, 'অন্য গোরিলারা আর কোনও উৎপাত করবে বলে মনে হয় না। চলো, আমরা এগোই।'

ম্যাহোনি আর কথা না বলে তার দু' হাত দিয়ে আমার হাতটা ধরে গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে ঝাঁকিয়ে দিল। আমরা আবার এগোতে শুরু করলাম।

বলাবাহুল্য, ওঠার চেয়ে নামার পর্বটা আরও দ্রুত হল। আমরা যখন উপত্যকায় পৌঁছে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি, তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে।

কঙ্গোর এই আদিম অরণ্য যে এক আশ্চর্য নতুন জগৎ, সেটা এসেই বুঝতে পারছি। এ পরিবেশ ভোলবার নয়। এক একটা গাছের বেড় পঞ্চাশ-ষাট ফুট, মাথায় একশো-দেড়শো ফুট। উপরে চাইলে আকাশ দেখা যায় না। মনে আপনা থেকেই একটা ভক্তিভাব আসে, যেমন আসে মধ্যযুগীয় কোনও গির্জায় ঢুকলে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এখানে লতাপাতার প্রাচুর্য হলেও, আগাছা প্রায় নেই বললেই চলে। জমি পরিষ্কার, কাজেই হাঁটার কোনও অসুবিধা নেই। ম্যাহোনি বলল, 'আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য বলে যখন কিছু নেই, তখন যে কোনও একটা দিক ধরে গেলেই হল। তবে হারানো দলের চিহ্নের জন্য দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে।'

জমি ঠিক সমতল নয়, একদিকে সামান্য ঢালু। কারণ এখনও আমরা চলেছি আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে। এই অন্ধকারেও রঙের অভাব নেই ; নানা রকম প্রজাপতি চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, ফুলও অপর্যাপ্ত, আর মাঝে মাঝে কর্কশ ডাক ছেড়ে এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে কাকাতুয়া শ্রেণীর বিচিত্র সব পাখি।

এর মধ্যে রকেট হঠাৎ আবার সরব হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ডেভিডের হাতে টান

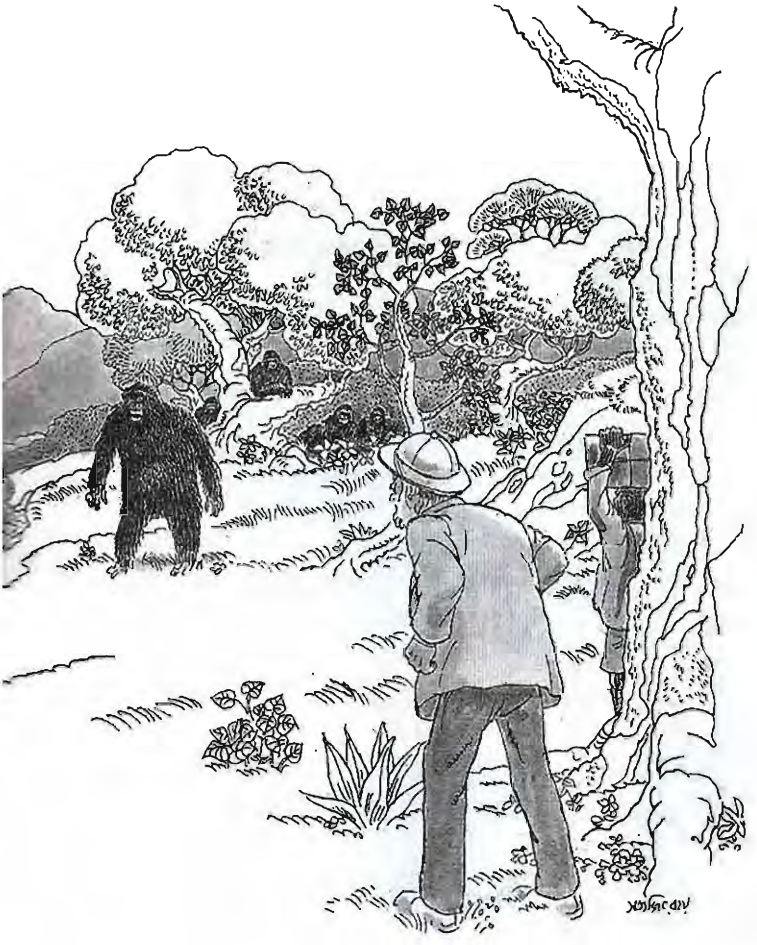

পড়েছে। কুকুর একটা বিশেষ দিকে যাবার জন্য উৎসুক।

আমরা থামলাম। ডেভিডের 'স্টপ ইট, রকেট'-এ কোনও ফল হল না। কুকুর তাকে টেনে নিয়ে গেল লিয়ানা লতায় ঘেরা বিশাল এক গুঁড়ির পিছনে।

আমরাও তার পিছনে গিয়ে কুকুরের উত্তেজনার কারণটা বুঝলাম।

একটি অচেনা মানুষের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে গাছের ছড়ানো শিকড়ের উপরে। গায়ের মাংসের অনেকখানি খেয়ে গেছে কোনও জানোয়ার, তবে জানোয়ারই তার মৃত্যুর কারণ কি না, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। এটা যে স্থানীয় কোনও উপজাতির লাশ নয়, সেটা পায়ের জুতো আর বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি দেখেই বোঝা যায়।

'হাতির কীর্তি,' বলল ম্যাহোনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, লাশের পাঁজরার হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে আছে।

কাহিন্দি দেখি মাথা নাড়ছে।

'নো টেম্বু, বোয়ানা। নো টেম্বু, নো কিবোকো।'

অর্থাৎ হাতিও না, হিপোও না।

'তবে কী বলতে চাও তুমি ?' বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল ম্যাহোনি।

'মোকেলে-ম্‌বেম্বে, বোয়ানা ! বায়া সানা, বায়া সানা !'

বায়া সানা—অর্থাৎ ভেরি ব্যাড।

ম্যাহোনি তো রেগে টং।—'আবোল তাবোল বকবে তো ঘাড় ধরে বের করে দেব তোমাকে।'

'কিন্তু আমি তো জানি ! আমি তো শুনেছি তার গর্জন !'

'এ সব কী বলছ কাহিন্দি ? কী বলতে চাও খুলে বলো তো ? কী শুনেছ তুমি ?'

'আমি তো বোয়ানা সান্তিনির দলেও কুলির সর্দার ছিলাম।'

এ খবরটা অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছে কাহিন্দি। সে নিরুদ্দিষ্ট ইটালিয়ান দলটার সঙ্গেও ছিল।

কাহিন্দি এবার খুলে বলল ব্যাপারটা। মুকেঙ্কুর পাদদেশে একটা খোলা জায়গায় রাত্তিরে ক্যাম্প ফেলে সান্তিনির দল। আমরা যেখানে আছি, তার আরও কিছুটা উত্তরে। মাঝরাত্তিরে একটা গর্জন শুনে কাহিন্দির ঘুম ভেঙে যায়। সে তাঁবু ছেড়ে বাইরে এসেই কিছু দূরে মাটি থেকে প্রায় আট-দশ হাত উপরে অন্ধকারে এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখতে পায়। তারপর কাহিন্দি আর সেখানে থাকেনি। মাইলখানেক দৌড়ে তারপর হেঁটে ফিরে আসে সভ্য জগতে। তার অভিজ্ঞতার কথা সে অনেককে বলেছে, কিন্তু সাহেবরা কেউ বিশ্বাস করেনি। কাহিন্দির নিজের ধারণা, ইটালিয়ান দলের সকলেই এই দানবের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

'তা হলে তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কেন ?' প্রশ্ন করল ম্যাহোনি। 'নাকি আমাদের দল থেকে পালাবার মতলব করছিলে ?'

কাহিন্দি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'এসেছি রুটির জন্য, বোয়ানা। আবার সে দানবকে দেখলে আবার পালাতাম—তবে এখন বোয়ানা শঙ্কুর অস্ত্র দেখে ভরসা পেয়েছি। আর পালাব না।'

'তা হলে তোমার কুলিদেরও সে কথা বলে দেবে। যারা একবার এসেছে, তারা আর দল ছেড়ে যেতে পারবে না, এই তোমায় বলে দিলাম।'

চাঞ্চল্যকর ঘটনার শেষ এখানেই নয়। শ্বেতাঙ্গের লাশ আবিষ্কার আর কাহিন্দির স্বীকারোক্তির পর আবার রওনা দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে এক পিগমির দলের সামনে আমাদের পড়তে হল।

চার ফুট থেকে সাড়ে চার ফুট লম্বা এই পিগমিরা যে এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে, সেটা আমার ধারণা ছিল না। দলটার সামনে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব টের পাইনি। আর সামনে পড়া মাত্র তারা আমাদের ঘিরে ফেলল। ম্যাহোনি গলা তুলে বলল, 'ভয় নেই, এরা নিরীহ। তবে এদের কৌতূহলের শেষ নেই।'

প্রত্যেকের হাতে তিরধনুক, আর তূণের সঙ্গে বাঁধা একটি করে চামড়ার থলি। তিরের ডগায় যে খয়েরি রং—সেটা যে বিষ, তা আমি জানি। বইয়ে পড়েছি, এরা কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শিকার করে, এদের মধ্যে হিংস্রভাব এতটুকু নেই। এদের দেখেও সেটাই মনে হয়।

ম্যাহোনি এগিয়ে গিয়ে এদের সঙ্গে বাণ্টু ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। কয়েকজন এগিয়ে এসেছে রকেটের দিকে। আফ্রিকায় দুর্ধর্ষ শিকারি, বুনো কুকুরের অভাব নেই, কিন্তু এ জাতের কুকুর এরা কেউ কখনও দেখেনি।

ম্যাহোনির কথা তখনও চলেছে, এমন সময় দেখলাম পিগমিরা তাদের থলি থেকে

নানারকম জিনিসপত্র বার করতে শুরু করেছে।

আশ্চর্য ! এ যে সবই আমাদের সভ্য জগতের জিনিস ! বাইনোকুলার, কম্পাস, ক্যামেরা, ঘড়ি, ফাউনটেন পেন, জুতো, ফ্লাস্ক—এ সব এরা পেল কোথায় ?

কথা শেষ করে ম্যাহোনি আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ এরা গত কয়েক মাসের মধ্যে এ অঞ্চলে দেখেছে। এ সব জিনিস কোত্থেকে পাওয়া, বুঝতেই পারছ।'

তিনটি দলই যে প্রাণে মারা পড়েছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে আরেকটি পিগমি তার থলি থেকে আর একটি জিনিস বার করেছে, যেটা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

একটা বই—এবং সেটা আমার খুবই চেনা।

আমি এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াতে বিনা বাক্যব্যয়ে পিগমিটি সেটা আমার হাতে তুলে দিল।

আমি ম্যাহোনিকে বললাম, 'জিজ্ঞেস করো তো এ বইটা আমি নিতে পারি কি না ?'

পিগমি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। আমি আমার পকেটে ভরে নিলাম ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ। ঘটনাটা এতই বিস্ময়কর যে, কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ম্যাকফারসনও যে মৃত, সেটার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে ?

'অতিকায় জানোয়ার সম্বন্ধে এরা কোনও খবর দিতে পারে কি ?'

ম্যাহোনি বলল, 'না। সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি আমি। তবে এরা বলছে, আকাশে একটা অদ্ভুত জিনিস উড়তে দেখেছে।'

'পাখি ?' সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

'না, পাখি না। কোনও যান্ত্রিক যানও নয়, কারণ ওড়ার কোনও শব্দ ছিল না।'

পিগমিরা চলে গেল। আমরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম।

সন্ধ্যা সাতটায় আমরা ক্যাম্প ফেললাম। কাছেই একটা খরস্রোতা নদীর শব্দ পাচ্ছি ; কাল সেটা পেরোতে হবে আমাদের।

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। কী আছে আমাদের কপালে, কে জানে।

বাইরে বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন। সেই সঙ্গে হাওয়াও দিচ্ছে। এই বোধ হয় বৃষ্টি শুরু হল।

১০ই মে, রাত পৌনে বারোটা

সাংঘাতিক ঘটনা। আমার হাতে কলম স্থির থাকছে না এখনও।

গতবার ডায়রি লিখে মশারি তুলে বিছানায় উঠব, এমন সময় বাইরে থেকে চিৎকার।

ডেভিড আর রকেট ঘুমোচ্ছিল, দুজনেই এক মুহূর্তে সজাগ। তিনজনে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। ক্রোল, সন্ডার্স, ম্যাহোনি, সকলেই তাঁবুর বাইরে হাজির। আমাদের দৃষ্টি কুলিদের তাঁবুর দিকে, কারণ সেদিক থেকেই চিৎকারটা এসেছে। বাইরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। অন্যদিন তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বলে, আজ বৃষ্টিতে সে আগুন নিবে গেছে।

চিৎকার এখন আর্তনাদে পরিণত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি একটা দুম দুম শব্দ—যেন বিশাল একটা দুরমুশ পেটা হচ্ছে জমিতে।

সন্ডার্স আর আমি দুজনেই টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলাম, শব্দ লক্ষ্য করে টর্চ ফেলতেই বর্ষণের বক্ররেখা ভেদ করে এক ভয়ংকর দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কুলিদের পর পর দুটো তাঁবু তছনছ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে—যেন তাদের উপর দিয়ে স্টিমরোলার চলে গেছে। তৃতীয় তাঁবুরও সেই অবস্থা হতে চলেছে, কারণ জ্বলন্ত চোখবিশিষ্ট একটি অতিকায় প্রাণী সেটার দিকে এগিয়ে আসছে দুই পা ফেলে।

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর যুগের সবচেয়ে হিংস্র মাংসাশী জানোয়ার টির‍্যানোসরাস রেক্স।

'ইয়োর গান, শঙ্কু, ইয়োর গান !'—চিৎকার করে উঠল ক্রোল ও সন্ডার্স একসঙ্গে। ইতিমধ্যে ম্যাহোনি দুটো গুলি চালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি।

আমি কোট ছেড়ে ফেলেছিলাম, তাই অ্যানাইহিলিনের জন্য তাঁবুতে ফিরে যেতে হল। কয়েক সেকেন্ডের কাজ, কিন্তু তারই মধ্যে দেখলাম, ডেভিডের জাঁদরেল গ্রেট ডেন তাঁবুর ভিতর ফিরে এসে ল্যাজ গুটিয়ে থরথর করে কাঁপছে।

বাইরে বেরোতেই এক চোখ ধাঁধানো নীল আলো, আর তার সঙ্গে এক কর্ণভেদী বজ্রনিনাদ আমার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুটোকেই যেন সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দিল। আমার আর অ্যানাইহিলিনের ঘোড়া টেপা হল না।

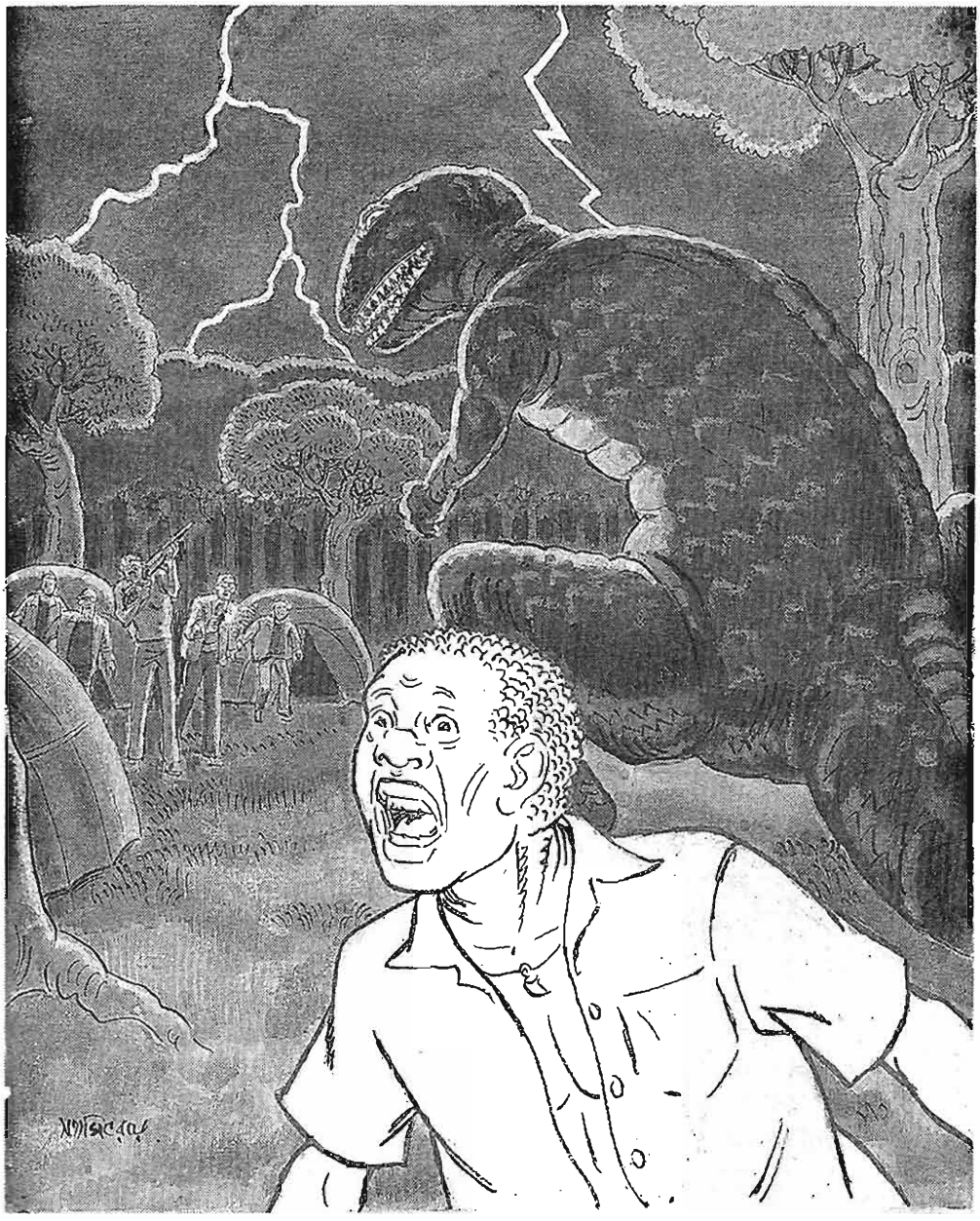

তারপরেই আরেকটা বিদ্যুতের ঝলকে দেখলাম টির‍্যানোসরাস তার পথ পরিবর্তন করে আমাদের দিক থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

'ইট্‌স বিন স্ট্রাক বাই লাইটনিং!'—চেঁচিয়ে উঠল ম্যাহোনি।

'কিন্তু তাতেও ওকে তেমন কাবু করতে পারেনি,' আমি বললাম।' কী সাংঘাতিক শক্তিশালী জানোয়ার!'

বিধ্বস্ত তাঁবুগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম আমাদের তিনজন কুলি জানোয়ারের পায়ের চাপে পিষে গেছে। কাহিন্দি এবং অন্য তিনজন কুলি চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছিল, তাই তারা বেঁচে গেছে।

যে যার তাঁবুতে ফিরে এলাম। তবু ভাল যে, যত গর্জন, তত বর্ষণ হল না। এই বিভীষিকার পর প্রকৃতির অঝোর ক্রন্দন বরদাস্ত করা যেত না।

সকলকেই একটা করে আমার তৈরি সমনোলিন ঘুমের বড়ি দিয়ে দিয়েছি। রাত্রে ঘুম না হলে কালকের ধকল সইবে না।

মোকেলে-ম্‌বেম্বে তা হলে মিথ্যে নয়!

১৩ই মে, নাইরোবি

কঙ্গোর এই অভিযান আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কোঠায় পড়ে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমন সব অপ্রত্যাশিত, শ্বাসরোধকারী ঘটনার সমাবেশ একমাত্র গল্পেই পাওয়া যায়—তাও বেশি গল্পে নয়। সভ্যজগতে যে আর কোনওদিন ফিরতে পারব, তা ভাবিনি। সেটা যে সম্ভব হয়েছে, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। অবিশ্যি সেই সঙ্গে আমাদের দলের প্রত্যেকের আশ্চর্য সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করতে হয়।

১০ই মে সকালে উঠেই যেটা দেখলাম, সেটা হল ভিজে মাটিতে টির‍্যানোসরাসের পায়ের ছাপ।

ছাপ সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। এখন কথা হচ্ছে—আমরা যাব কোন দিকে?

কথাটা ম্যাহোনিকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, 'আমরা এমনিও উত্তরেই যাচ্ছিলাম, কাজেই এখন দিক পরিবর্তন করার কোনও মানে হয় না। পিছোতে তো আর পারি না; গেলে সামনেই যেতে হবে। আর জানোয়ারের কথা ভেবেও লাভ নেই। তার যদি আমাদের উপর আক্রোশ থাকে, তো সে আমাদের ধাওয়া করবেই—আমরা যেদিকেই যাই না কেন। আমার বিশ্বাস, তার গায়ে বাজ পড়ার ফলে সে খানিকটা কাবু হয়েছে; তার তাগদ ফিরে পেতে কিছুটা সময় লাগবে।'

ডেভিড মানরো সব শুনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলল, 'আমরা পায়ের ছাপই অনুসরণ করব। বিংশ শতাব্দীতে দিনের আলোয় টির‍্যানোসরাসকে দেখতে পেলে, সারা জীবন আর কিছু না করলেও চলবে।'

আমরা সাতটার মধ্যেই রওনা হয়ে পড়লাম। আমার মন বলছে, এখনও অনেক রহস্যের সমাধান হতে বাকি আছে। কুলি তিনজন কম, কাজেই কিছু হালকা মাল আমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে বইছি। কাহিন্দি যে এখনও রয়েছে সেটা শুধু ম্যাহোনির ধমকানির জন্য। তবে কতদিন থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আজ দিনটা পরিষ্কার, যদিও বনের দুর্ভেদ্য অন্ধকার তাতে বিশেষ কমছে না। আমরা পায়ের ছাপ ধরে এগোচ্ছি। অসমান দূরত্বে পড়েছে ছাপগুলো; দেখে মনে হয় জানোয়ারটা একটু খুঁড়িয়ে চলছিল।

মিনিট দশেক চলার পর যে নদীটার শব্দ পাচ্ছিলাম, সেটা সামনে এসে পড়ল। হাত পনেরোর বেশি চওড়া নয়। জলও হাঁটুর বেশি গভীর নয়, তাই হেঁটে পার হতে অসুবিধা হল না। জানোয়ারও নদী পেরিয়েছে, কারণ উলটো দিকে তার পায়ের ছাপ রয়েছে।

আরও সিকি মাইল গিয়ে দেখি, জমির জাত বদলে গেছে। এখানে আবার সেই ভলক্যানিক অ্যাশ আর পাথরের কুচি। আবার আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। এখানে বনের ঘনত্ব যেন কিছুটা কম, মাথার উপর পাতার অভেদ্য ছাউনিটা

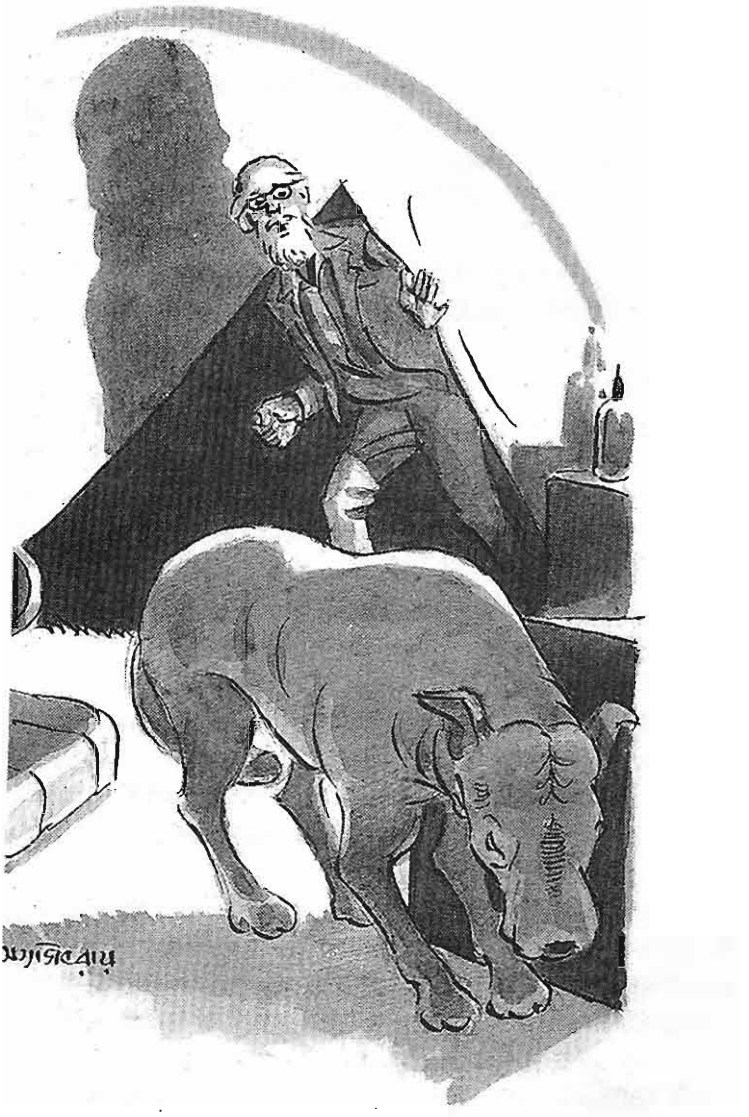

খানিকটা পাতলা হয়ে আকাশকে উঁকি দিতে দিচ্ছে।

এই জমিতে একটা জায়গার পরে পায়ের ছাপ ক্ষীণ হয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেছে। জানোয়ার কোনদিকে গেছে তা বোঝার আর উপায় নেই।

'সোজা এগিয়ে চলো,' বলল ম্যাহোনি।

কিন্তু এগোনো আর হল না।

ভেলকির মতো গাছপালা ঝোপঝাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে একদল খাকি পোশাক পরিহিত কাফ্রি আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে তিরধনুক, এবং সেগুলো সবই আমাদের দিকে তাগ করা।

ম্যাহোনির হাতের বন্দুকটা মুহূর্তের মধ্যে উঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু চোখের পলকে তার বাঁ পাশ থেকে একটা তির এসে বন্দুকের নলটায় আঘাত করে সেটাকে ম্যাহোনির হাত থেকে ছিটকে মাটিতে ফেলে দিল।

তারপর তিরন্দাজ নিজেই এসে বন্দুকটা ম্যাহোনির হাতে তুলে দিয়ে, বাণ্টু ভাষায় তাকে কী যেন বলল। ম্যাহোনি আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'এরা এদের সঙ্গে যেতে বলছে।'

'কোথায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'যেখানে নিয়ে যাবে।'

'এরা কারা ?'

'এরা বাণ্টু, তবে পুরোপুরি অরণ্যবাসী নয়, সেটা দেখেই বুঝতে পারছ। বোঝাই যাচ্ছে এরা কারুর আদেশ পালন করছে। সে ব্যক্তিটি কে, সেটা এদের সঙ্গে না গেলে বোঝা যাবে না।'

অগত্যা যেতেই হল। কমপক্ষে পঞ্চাশটি লোক যেখানে ধনুক উঁচিয়ে রয়েছে, সেখানে না যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

পাহাড়ের গা দিয়ে মিনিটপাঁচেক গিয়ে যেখানে পৌঁছোলাম, সেখানে প্রকৃতির উপর মানুষের হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। চারিদিকের গাছ কেটে ফেলে একটা খোলা জায়গা তৈরি করা হয়েছে, তার এক পাশে কাঠের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা সুদৃশ্য কাঠের ক্যাবিন। সেটাকে ফরেস্ট বাংলো বললে ভুল হবে না।

আমরা আমাদের গ্রেপ্তারকারীদের নির্দেশে এগিয়ে গেলাম ক্যাবিনের দিকে। মানুষ আছে কি ওই ক্যাবিনে ?

হ্যাঁ, আছে।

আগে কণ্ঠস্বর, তারপর সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারী বেরিয়ে এলেন ক্যাবিনের বারান্দায়।

'গুড মর্নিং, গুড মর্নিং !'

লাল চুল আর মুখ ভর্তি লাল গোঁফদাড়ি দেখে চিনতে মোটেই কষ্ট হল না লোকটিকে।

ইনি জার্মানির বহুমুখী প্রতিভাধর বিজ্ঞানী প্রোফেসর কার্ল হাইমেনডর্ফ।

'ওয়েলকম, প্রোফেসর শঙ্কু ! ওয়েলকম, হের ক্রোল !'

হাইমেনডর্ফ এবার হাতে তালি দিয়ে বাণ্টু দলটাকে ডিসমিস করে দিলেন।

'আসুন সবাই, ওপরে আসুন।'

আমরা পাঁচজন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ভদ্রলোকের পিছন পিছন বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরে আরও দুজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক রয়েছেন, দুজনেই আমার চেনা—ডক্টর গাউস ও প্রোফেসর এরলিখ। পরিচয়পর্ব শেষ হবার পর হাইমেনডর্ফ বলল, 'আমাদের দলের আরেকজন, এঞ্জিনিয়ার হাল্‌সমান, একটু কাজে ব্যস্ত আছেন। তাঁর সঙ্গে পরে আলাপ হবে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি, আপনারা এখানে এসেছেন। নাইরোবির সঙ্গে রেডিয়ো কনট্যাক্ট আছে আমাদের। শুধু নাইরোবি কেন, পুবে নাইরোবি আর পশ্চিমে কিসাঙ্গানি, দুয়ের সঙ্গেই আছে। আবার কিসাঙ্গানি মারফত যোগ আছে দেশের সঙ্গে, কাজেই দুনিয়ায় কোথায় কী ঘটছে, সব খবরই আমরা পাই।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনারা যে বেঁচে আছেন, সে খবর তো বাইরের লোক জানে না।'

হাইমেনডর্ফ হো হো করে হেসে উঠল।

'সে খবর তাদের জানতে দিলে, তারা নিশ্চয়ই জানবে। হয়তো আমরা জানতে দিতে চাই

না।'

'কেন ?'

'কাজের অসুবিধা হবে বলে।'

আমি আর কিছু বললাম না। কাজ যে চলছে এখানে, সে তো বুঝতেই পারছি, যদিও কী কাজ সেটা এখনও জানি না।

এবার সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

'বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে থাকলে আপনি ইটালিয়ান এবং ব্রিটিশ অভিযানের দলটি আসার কথাও শুনেছিলেন নিশ্চয়ই।'

'শুনেছিলাম বইকী ; কিন্তু তারপর তাদের কী হল সে খবর তো পাইনি।'

ক্রোল বলল, 'তোমাদের এ অঞ্চলে যে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বাস করে সে খবর রাখ কি ?'

হাইমেনডর্ফের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ?'

'টির‍্যানোসরাস রেক্স, টু বি এগজ্যাক্ট।'

'তোমরা তাকে দেখেছ ?'

'শুধু দেখেছি না, প্রাণীটা আমাদের ক্যাম্পে হামলা করেছিল। তার পায়ের চাপে আমাদের তিনটি কুলি মারা গেছে।'

'কী আশ্চর্য,' বলল হাইমেনডর্ফ, 'কিন্তু কই, আমাদের এ তল্লাটে তো সে প্রাণী আসেনি।'

একটি কৃষ্ণাঙ্গ বেয়ারা আমরা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কফি এনেছিল, সেটা খাওয়া শেষ হলে পর হাইমেনডর্ফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাদের এইভাবে ধরে আনানোর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিশেষ দরকার ছিল। যখন খবর পেলাম তোমরা কাছাকাছির মধ্যে এসে গেছ, তখন সুযোগটা ছাড়তে পারলাম না। এবার চলো, তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাই। আমার মনে হয়, তোমাদের ইন্টারেস্টিং লাগবে।'

হাইমেনডর্ফ, গাউস ও এরলিখ রওনা দিল ; আমরা তাদের পিছনে সার বেঁধে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম।

বাংলোর চারপাশটা গাছ আর ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হলেও, মাটিতে ভলক্যানিক অ্যাশ এখনও রয়েছে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভলক্যানো থেকে গলিত লাভার স্রোত বেরোয় সেটা ঠিকই, কিন্তু মানুষের পক্ষে আসল ভয়ের কারণ হয় এই ছাই ও বিষাক্ত গ্যাস। লাভার স্রোতের গতি খুবই মন্থর ; মানুষ অনায়াসে দৌড়ে সেই স্রোতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আমরা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পুবে পাহাড়ের প্রাচীর উঠে গেছে উপর দিকে, তারই গায়ে এক জায়গায় দেখি একটা বিশাল কাঠের ভেজানো দরজা।

'একটা স্বাভাবিক গুহাকে আমরা ব্যবহার করছি কাজের ঘর হিসেবে,' বলল হাইমেনডর্ফ। 'গুহাটা প্রায় চল্লিশ গজ গভীর। এ রকম আরও দুটো গুহা আছে, দুটোই আমাদের কাজে লাগে। প্রকৃতি আশ্চর্য ভাবে সাহায্য করেছে আমাদের কাজে।'

'কিন্তু প্রকৃতি যদি উৎপাত শুরু করেন ?' প্রশ্ন করল ক্রোল।

'মানে ?'

'এই সব আগ্নেয়গিরিতে যে বিস্ফোরণ হবে না, তার কী স্থিরতা ?'

'তার উপক্রম দেখলে আমাদের দ্রুত পালাবার ব্যবস্থা আছে,' রহস্য করে বলল হাইমেনডর্ফ।

আরও কিছু দূর গিয়ে একটা টানেলের মুখে পৌঁছোলাম আমরা। তিন জার্মান সমেত আমরা সেটায় প্রবেশ করলাম।

ভিতরে ঢুকেই আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হল, আর সেটা যে সত্যি, সেটা হাইমেনডর্ফের কথায় প্রমাণ হয়ে গেল।

'এটা হল একটা কিম্বারলাইট পাইপ,' বলল হাইমেনডর্ফ, 'দেওয়ালে যে পাথর দেখছ, তাতে হিরে লেগে আছে।'

হিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানে একাধিক থিওরি আছে। একটা থিওরি বলে, ভূগর্ভে প্রায় হাজার মাইল নীচে প্রচণ্ড চাপ ও উত্তাপের ফলে কার্বন ক্রিস্ট্যালাইজড হয়ে হিরেয় পরিণত হয়। সেই হিরে অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত খনিজ পদার্থের স্রোতের সঙ্গে উপরে উঠে আসে। সেই হিরেই লেগে থাকে পাথরের গায়ে এই সব সুড়ঙ্গের মধ্যে।

হাইমেনডর্ফ বলে চলল, 'একটা সাধারণ কিম্বারলাইট পাইপে ১০০ টন পাথর কেটে তার থেকে মাত্র ৩২ ক্যারাট হিরে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক আউন্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই সুড়ঙ্গে শাবলের এক আঘাতে ৫০০ ক্যারাট হিরে পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

সুড়ঙ্গে যে খনন কাজ চলছে, সেটা দেখেই বোঝা যায়। শাবল পড়ে আছে মাটিতে, সারা সুড়ঙ্গের গায়ে আলো বসানো রয়েছে, মাটিতে লাইনের উপর ট্রলি রয়েছে—মাল বাইরে বার করার জন্য।

'এটা কি ব্লু ডায়মন্ড ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তুমি তো খবরটবর রাখ দেখছি', বাঁকা হাসি হেসে বলল হাইমেনডর্ফ। 'হ্যাঁ, এটা ব্লু ডায়মন্ড। একটা বিশেষ শ্রেণীর ব্লু ডায়মন্ড—টাইপ টু-বি। রত্ন হিসেবে এর দাম কিছুই নয়। কিন্তু এই বিশেষ টাইপের হিরে ইলেকট্রনিকসে বিপ্লব এনে দিয়েছে। ব্লু ডায়মন্ডের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এই রকম পাইপ আরও আছে এখানে, সেগুলোতেও কাজ চলছে। কাফ্রিদের বাগে আনতে পারলে কাজ ভালই করে। আমার খনিতে শ্রমিক এবং পুলিশ দুই-ই কৃষ্ণাঙ্গ।'

আমরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। যে পথে গিয়েছি, সেই পথেই আবার ফেরা শুরু করলাম। এবার সেই বন্ধ দরজাটার সামনে এসে হাইমেনডর্ফ সেটাকে খুলে দিয়ে আমাদের ভিতরে ঢুকতে বলল।

এ যেন আলিবাবার গুহা। ভিতরে আসবাবপত্র যন্ত্রপাতির এমন সমারোহ যে, একবার ঢুকলে সেটাকে আর গুহা বলে মনেই হয় না। গবেষণাগার, বিশ্রামকক্ষ, কনফারেন্স রুম—সব কিছুই বলা চলে এটাকে।

'এত সব জিনিসপত্র দেখে অবাক হচ্ছ বোধ হয়,' বলল হাইমেনডর্ফ। 'শহরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে সরবরাহের ব্যাপারটা আজকের যুগে কোনও সমস্যাই নয়।'

চারজন অস্ত্রধারী দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে তারা পুলিশ।

ক্রোল ছাড়া আমরা সবাই সোফায় বসলাম। ক্রোলের একটা ছটফটে ভাব, সে ঘুরে ঘুরে দেখছে। একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা কি রিমোট কনট্রোলে কোনও কিছুকে চালনা করছ নাকি ? এতে নানারকম নির্দেশ লেখা সুইচ দেখছি।'

হাইমেনডর্ফ শুকনো গলায় বলল, 'হাল্‌সমান একজন অতি দক্ষ এঞ্জিনিয়ার। আর ইনভেনটর হিসেবে প্রোফেসর শঙ্কুর সমকক্ষ না হলেও, গাউসের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। মানুষের পরিশ্রম লাঘব করা যখন ইলেকট্রনিকসের একটা প্রধান কাজ, তখন নানারকম বাইরের কাজ যাতে ঘরে বসেই করা যায়, তার চেষ্টা আমরা করি বইকী। তোমরা যে এদিকে আসছ, সেটা তো আমি গুহায় বসেই জেনেছি।'

গুহার একদিকে পাশাপাশি চারটে টেলিভিশন স্ক্রিন দেখছিলাম ; হাইমেনডর্ফ উঠে গিয়ে পর পর চারটে বোতাম টিপতেই জঙ্গলের চারটে অংশের ছবি তাতে দেখা গেল।

'ভিডিও ক্যামেরা লাগানো আছে গাছের গায়ে, বনের চার জায়গায়', বলল হাইমেনডর্ফ।

ক্রোল অগত্যা সোফায় এসে বসল।

এবার হাইমেনডর্ফের চেহারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিল। হালকা ভাবটা চলে গিয়ে তার জায়গায় এল এক থমথমে গাম্ভীর্য। সে উঠে দাঁড়িয়ে দু'-একবার পায়চারি করে গলা খাঁকরে নিয়ে বলল, 'বুঝতেই পারছ, আমরা যে কাজটা এখানে করছি, তাতে গোপনীয়তা রক্ষা করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা চার কর্মী, কিসাঙ্গানি আর নাইরোবিতে আমাদের নিজেদের লোক, আমার বেতনভোগী কাফ্রি কর্মীরা, জার্মানিতে আমাদের এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষক, আর তোমরা ক'জন ছাড়া আর কেউ এই ব্লু ডায়মন্ড মাইন্‌সের কথা জানে না। তোমরা জেনেছ, কারণ তোমরা কাছাকাছি এসে পড়েছিলে বলে তোমাদের আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু বুঝতেই পারছ যে, তোমাদের মারফত খবরটা বাইরে পাচার হয়, সেটা আমি কোনও মতেই ঘটতে দিতে পারি না।'

হাইমেনডর্ফ কথা থামাল। গুহার মধ্যে চূড়ান্ত নৈঃশব্দ্য। ম্যাহোনি দাঁতে দাঁত চেপে কোনওমতে নিজেকে সামলে রেখেছে। বাকি তিনজন পাথরের মতো অনড়, তাদের দৃষ্টি হাইমেনডর্ফের দিকে। গাউস ও এরলিখকে দেখে তাদের মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। নিঃশব্দতা ভেঙে ক্রোলই হঠাৎ কথা বলে উঠল হাইমেনডর্ফকে উদ্দেশ করে।

'কার্ল, হিটলারের আমলে তোমার কী ভূমিকা ছিল, সেটা এদের বলবে কি? বুখেনওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদি বন্দিদের উপর এক তরুণ পদার্থবিদ কী ধরনের অত্যাচার—'

'উইলহেল্‌ম!'

হাইমেনডর্ফ গর্জিয়ে উঠেছে। ক্রোলের যা বলার, তা বলা হয়ে গেছে, তাই সে চুপ করল। আমি অবাক হয়ে দেখছি হাইমেনডর্ফের দিকে। চোখে ওই ক্রূর দৃষ্টি, ওই ইস্পাত শীতল কণ্ঠস্বর—একজন প্রাক্তন নাৎসির পক্ষে মানানসই বটে।

আর একটি শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি গুহায় এসে ঢুকলেন। ছ' ফুটের উপর লম্বা, ঘন কালো ভুরু, এক মাথা অবিন্যস্ত কালো চুল, চোখে পুরু চশমা। ইনিই নিশ্চয়ই হাল্‌সমান। হাইমেনডর্ফের দিকে চেয়ে অল্প মাথা নেড়ে ভদ্রলোক যেন বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কাজটা হয়ে গেছে।

'সাঙ্গা! মোবুটু!'

হাইমেনডর্ফের ডাকে দুটি কাফ্রি এগিয়ে এল। তারপর বান্টু ভাষায় হাইমেনডর্ফ তাদের যে আদেশটা করলেন, তার ফল হল এই যে, ম্যাহোনি আর ক্রোলের হাত থেকে বন্দুক দুটো তাদের হাতে চলে গেল। প্রতিবাদে লাভ নেই, কারণ অন্য দুজন প্রহরী তাদের তিরধনুক উঁচিয়ে রয়েছে।

এইবার হাইমেনডর্ফ আমার দিকে চেয়ে আবার কথা শুরু করল।

'প্রোফেসর শঙ্কু, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।'

'বলো।'

'তোমাকে আমার দলে চাই।'

এই অসম্ভব প্রস্তাবের জুতসই জবাব চট করে আমার মাথায় এল না। হাইমেনডর্ফ সামান্য বিরতির পর আবার কথা শুরু করল—

'গাউসের কাছে শুনেছি তোমার দুটি আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা। একটি পিস্তল ও একটি

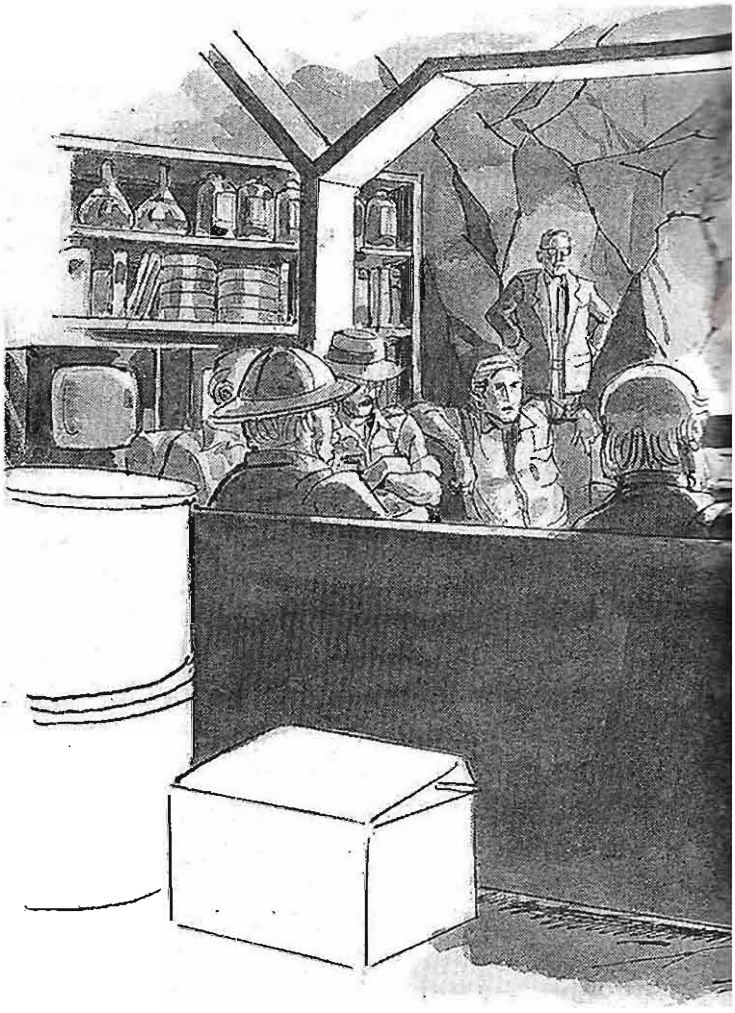

ওষুধ। টোটা জিনিসটা শুধু যে অনেক খরচ, তা-ই নয়—লক্ষ্য অব্যর্থ না হলে জানোয়ার মারা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিকারি কেউ নেই। অথচ এই সে দিনই এক হাতির পাল এসে আমাদের অনেক ক্ষতি করে গেছে। তোমার পিস্তলে শুনেছি মোটামুটি তাগ করে ঘোড়া টিপলেই কাজ হয়। সে রকম তোমার ওষুধেও শুনেছি ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। অ্যাফ্রিকার ব্যারামগুলো বিদঘুটে। এরলিখের এসেই ম্যালেরিয়া হয়েছিল, আর হাল্‌সমানের হয়েছিল স্লিপিং সিকনেস। জার্মান ওষুধ নেহাত ফেলনা নয়, কিন্তু তোমার ওষুধের মতো অমন অব্যর্থভাবে কার্যকরী নয়। প্রধানত এই দুটি জিনিস চাই বলেই তোমাকে চাই। তা ছাড়া, তোমার পরামর্শেরও দরকার হতে পারে মাঝে মাঝে। ভয় নেই, তুমি আরামেই থাকবে। গুণী লোকের সমাদর আমরা সব সময়ই করি। আর একজনের ক্ষেত্রেও সেটা করেছি।'

একটা অদম্য ইচ্ছে হচ্ছিল পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে এই জঘন্য মানুষটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিই, কিন্তু জানি তার পরমুহূর্তেই ওই তিরন্দাজরা আমাদের সকলকে খতম করে দেবে।

বললাম, 'আমার দল ছেড়ে যাবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

হাইমেনডর্ফ যেন আমার কথাটা মানল না। সে বলল, 'তোমার মতো বহুমুখী প্রতিভা আমারও নেই, সেটা আমি স্বীকার করি। টাইপ টু-বি-ব্লু ডায়মন্ডের দৌড় কতটা, এর সাহায্যে ইলেকট্রনিক মারণাস্ত্রের কী উন্নতি সম্ভব, সেটা হয়তো তুমি যতটা চট করে বার করতে পারবে, তেমন আর কেউ পারবে না। বলা বাহুল্য, তোমাকে আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।'

'মাপ করো, তোমাকে কোনওরকম ভাবে সাহায্য করার ইচ্ছা আমার নেই।'

'এই তোমার শেষ কথা ?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে তারপর মুখ খুলল হাইমেনডর্ফ।

'ভেরি ওয়েল।'

রকেটের হঠাৎ ছটফটানি আর গোঙানির কারণ কী ? বাইরে থেকে যে তীক্ষ্ণ চিৎকার

শুনছি, সেটা কি বাঁদরের ? আসার সময় গাছে কিছু 'কলোবাস মাঙ্কি' দেখেছিলাম।

'জেন্টলমেন,' বলল হাইমেনডর্ফ, 'এবার তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে। আমাদের অনেক কাজ। কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারব না, বিশেষ করে সে কথায় যখন কাজ হবে না। আমাদের লোক তোমাদের আবার পৌঁছে দিয়ে আসবে যথাস্থানে।'

যে যন্ত্রটা ক্রোল দেখছিল, এখন সেটার সামনে গিয়ে হাল্‌সমান দাঁড়িয়েছে।

'তা হলে এসো তোমরা,' বলল হাইমেনডর্ফ।

হাল্‌সমান ছাড়া সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। সূর্য পাহাড়ের পিছনে নেমে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে।

'গুডবাই, জেন্টলমেন।' হাইমেনডর্ফ তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেল।

চারজন কাফ্রি আমাদের দিকে তির উঁচিয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছি, আমাদের সময় ঘনিয়ে এল। একটা কিছু করা দরকার। রাস্তাও একটাই।

আমার পিস্তলের সুবিধা হচ্ছে তাকে দেখলে মারণাস্ত্র বলে মনে হয় না। মরিয়া হয়ে পকেট থেকে অ্যানাইহিলিন বার করে তিরন্দাজদের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিলাম। তিনজন তৎক্ষণাৎ উধাও। চতুর্থজনের জন্য পিস্তল ঘুরিয়ে আর একবার ঘোড়া টেপার সময়ে দেখলাম, জ্যামুক্ত তির আমারই দিকে ধেয়ে আসছে। তিরন্দাজ উধাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিরটা আমার ডান কানের পাশের খানিকটা চুল উপড়ে নিয়ে সশব্দে গুহার কাঠের দরজায় গিয়ে বিঁধল।

রকেট অসম্ভব ছটফট করছে। কলোবাস মাঙ্কিগুলো গাছের উপর চিৎকার করে লাফালাফি করছে।

'মাইন গট্।' চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল—'লুক অ্যাট দ্যাট !'

পুবে বিশ গজ দূরে গাছের সারির মধ্য দিয়ে আমাদেরই দিকে ধেয়ে আসছে টির‍্যানোসরাস রেক্স ! সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার চোখদুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মতো, তার আকর্ণবিস্তৃত হাঁ-এর ভিতর দু' পাটি ক্ষুরধার দন্তের সারি যেন চাইছে আমাদের চিবিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলতে।

আমি পকেট থেকে অ্যানাইহিলিনটা বার করে পরমুহূর্তে বুঝতে পারলাম, আমার পিস্তল এই দানবের ক্ষেত্রে কাজ করবে না।

ওটা যে প্রাণী নয় ! ওটা রোবট ! হাইমেনডর্ফ অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি যান্ত্রিক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার !

আর তাকে চালাচ্ছে ওই গুহায় বসে এঞ্জিনিয়ার হালস্‌মান।

ক্রোলও ব্যাপারটা বুঝেছে, কারণ ও ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ঢুকেছে গুহার ভিতর।

যান্ত্রিক দানব দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। অস্ত্রে কোনও কাজ হবে না, তাই কতকটা আত্মরক্ষার জন্যই আমরা আবার গিয়ে ঢুকলাম গুহার ভিতর।

গিয়ে দেখি এক আশ্চর্য নাটকীয় দৃশ্য।

হাল্‌সমানের বাঁ হাত যন্ত্রের কনট্রোলের উপর, ডান হাতে ধরা রিভলভার সোজা তাগ করা ক্রোলের দিকে। ক্রোলের আচরণ কিন্তু ভারী অদ্ভুত। সে মৃদুস্বরে হাল্‌সমানের নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে, আর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে।

'হাল্‌সমান ! হাল্‌সমান ! হাল্‌সমান ! রিভলভারটা নামাও হাল্‌সমান ! রিভলভারটা নামাও !'

আশ্চর্য ! হাল্‌সমানের ডান হাত নেমে এল ধীরে ধীরে।

'এবার তোমার জানোয়ারের গতি বন্ধ করো হাল্‌সমান, জানোয়ারকে থামাও, আর আসতে দিয়ো না।'

হাল্‌সমানের বাঁ হাত আর একটা বোতামের দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এতক্ষণে আমাদের সকলের কাছেই পরিষ্কার।

ক্রোল হাল্‌সমানকে হিপ্নোটাইজ করেছে। বাইরে জানোয়ারের পদশব্দ থেমে গেল, কিন্তু আমাদের পা হঠাৎ টলায়মান।

মাটি নড়ছে। সমস্ত গুহার জিনিসপত্র থরথর করে কাঁপছে। রকেট প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে।

ভূমিকম্প—এবং এর পরে যদি অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনেক পশুপাখি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পায় তাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। রকেটের চাঞ্চল্যের কারণ এখন বুঝতে পারছি। বানরদের চেঁচামেচিও একই কারণে।

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

দশ হাত দূরে টির‍্যানোসরাস অনড়, তার দেহ ভূকম্পে আন্দোলিত হচ্ছে। চতুর্দিকে মানুষের আর্তনাদ শুরু হয়ে গেছে। আমরা দৌড় দেব, এমন সময় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল।

'শঙ্কু! শঙ্কু! দিস ওয়ে—শঙ্কু!'

ঘুরে দেখি—তাজ্জব ব্যাপার! ওই দূরে ক্রিস ম্যাকফারসন মরিয়া হয়ে আমাদের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার পিছনেই একটা হলুদ গোলক আকাশে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

রহস্যের সমাধান পরে হবে—এখন প্রথম কাজ হল পলায়ন।

দৌড় দিলাম ম্যাকফারসনের উদ্দেশে।

'ডোন্ট লেট দেম কাম!'—ম্যাকফারসন আমাদের পিছনে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে।

ঘুরে দেখি, হাইমেনডর্ফ, এরলিখ ও গাউসও ছুটেছে ম্যাকফারসনের দিকে।

চোখের পলকে ম্যাহোনি দুই ঘুষিতে প্রথম দুটিকে ধরাশায়ী করল। গাউস জব্দ হল সন্ডার্সের ঘুষিতে। কাহিন্দি নির্ঘাত কুলির দল সমেত পালিয়েছে; তাদের কথা ভাবার সময় নেই।

এক মিনিটের মধ্যে রকেট সমেত আমরা পাঁচজন ও ম্যাকফারসন প্রোপেন গ্যাসচালিত বেলুনে উড্ডীয়মান। মুকেঙ্কু তখন প্রচণ্ড গর্জনে অগ্ন্যুদ্গার শুরু করে দিয়েছে, লাভার স্রোত বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে, আকাশ বাতাস ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, প্রতিটি বিস্ফোরণের ফলে অগণিত প্রস্তরখণ্ড জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ছোট বড় সবরকম বন্য প্রাণী পরিত্রাহি ছুটে পালাচ্ছে প্রকৃতির এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

দেখতে দেখতে সব কিছু দূরে সরে গেল। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে আসছে। যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল, তাকে আবার ক্ষণকালের জন্য দেখা যাচ্ছে, কঙ্গোর আদিম অরণ্যের আদিগন্ত সবুজের এক পাশে এক টুকরো কমলার দীপ্তি জানিয়ে দিচ্ছে সহসা সুপ্তোত্থিত মুকেঙ্কুর অস্তিত্ব।

এতক্ষণে ম্যাকফারসন কথা বলল।

'তোমাদের দূর থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু কীভাবে যোগাযোগ করব সেটা বুঝতে পারছিলাম না। শেষটায় সুযোগ জুটে গেল দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে।'

আমি আমাদের দলের সকলের সঙ্গে ম্যাকফারসনের পরিচয় করিয়ে বললাম, 'কিন্তু তোমাকে এরা ধরে রাখল কেন?'

ম্যাকফারসন বলল, 'এই যে গ্যাসবেলুনটা দেখছ, এটা তো আমাদের, হাইমেনডর্ফের নয়। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে কাজ করতে হবে বলে এটা আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। দ্রুত পালানোর পক্ষে এর চেয়ে ভাল উপায় নেই। অবশ্যি এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।'

'সেটা কী?'

'খনিজবিদ্যায় আমি যে ডক্টরেট পেয়েছি, তার বিষয়টা ছিল 'ব্লু ডায়মন্ড'। এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানা লোক বড় একটা নেই। এ কথাটা জানার পর হাইমেনডর্ফ আমাকে রেখে দেয়। না হলে আমাকে আমার দলের আর সকলের মতো ওই যান্ত্রিক দানবের পায়ের তলায় পিষে মরতে হত। অবিশ্যি এই দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুই হয়তো শ্রেয় ছিল।'

ডেভিড প্রশ্ন করল, 'ওই আশ্চর্য দানব তৈরি করল কে?'

'পরিকল্পনা হাইমেনডর্ফের। রূপ দিয়েছে গাউস, এরলিখ, হাল্‌সমান আর পঞ্চাশজন বাণ্টু কারিগর। কারিগরিতে বাণ্টুদের সমকক্ষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। অনুসন্ধিৎসুদের বিনাশের জন্যই ওই দানবের সৃষ্টি।'

আকাশে মেঘ কেটে গেছে। আমরা চলেছি পুব দিকে। নীচে শহর দেখলেই গ্যাস কমিয়ে নেমে পড়ব।

আর একটা কথা বলতে বাকি আছে ম্যাকফারসনকে।

'আমাদের সবই গেছে, তবে সৌভাগ্যক্রমে একটা জিনিস আমার পকেটেই রয়ে গেছে। এই নাও।'

কবিগুরুর স্বাক্ষর সমেত ইংরিজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ আবার তার মালিকের কাছে ফিরে গেল।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৮
এই গল্পের কিছু তথ্য Michael Chrichton-এর Congo উপন্যাস থেকে নেওয়া।

প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ.এফ.ও.

১২ই সেপ্টেম্বর

ইউ. এফ.ও. অর্থাৎ আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট অর্থাৎ অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু। এই ইউ.এফ.ও. নিয়ে যে কী মাতামাতি চলছে গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে! সারা বিশ্বে বহু সমিতি গড়ে উঠেছে, যাদের কাজই হল এই ইউ.এফ. ও.-এর চর্চা। কতরকম ছবি যে সংগ্রহ হয়েছে এবং কাগজে ছাপানো হয়েছে এই উড়ন্ত বস্তুর, তার হিসেব নেই। এই সব সমিতির সভ্যরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ভিন্‌গ্রহের প্রাণীরা হরদম রকেটে করে উড়ে এসে পৃথিবীতে হানা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছবি যা বেরোয়, তার শতকরা নব্বই ভাগে দেখা যায়—এই রকেটের চেহারা হল একটা উলটানো মালসার মতো—যার জন্য এর নাম হয়েছে ফ্লাইং সসার। এই একটা কারণেই আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বুজরুকি বলে মনে হয়। এতরকম গড়ন থাকতে বার বার ওই একই রকম গড়ন হবে কেন? পৃথিবী থেকে মহাকাশে যে সব যান পাঠানো হয়েছে, তার একটার চেহারাও তো এরকম নয়! আমি নিজে একবার মিশরে একটা ইউ.এফ.ও-এর সামনে পড়েছিলাম, সে ঘটনা আমি আগেই বলেছি। সেটার আকার ছিল পিরামিডের মতো। তাই উড়ন্ত পিরিচের কথা শুনলেই আমার হাসি পায়।

এত কথা বলার কারণ এই যে, সম্প্রতি দুটি ইউ.এফ.ও.-র ছবি কাগজে বেরিয়েছে—একটি সুইডেনের অসটারমন্ড শহর থেকে তোলা, আর আর একটি তোলা খাস লেনিনগ্রাড থেকে। বোঝাই যায় দুটি একই রকেটের ছবি (যদি সেটা রকেট হয়ে থাকে), এবং কোনওটাই দেখতে মালসার মতো নয়। এই বিশেষ বস্তুটির আকৃতি মোটেই সরল নয়, কাজেই তাদের বর্ণনা দেওয়াও সহজ নয়। সেই কারণেই এটাকে মহাকাশযান বলে বিশ্বাস করা কঠিন নয়। সুইডেনের আকাশে বস্তুটি দেখা যায় দোসরা সেপ্টেম্বর, আর লেনিনগ্রাডে তেসরা। ইউরোপের অন্য জায়গা থেকেও দেখা গেছে বলে খবর এসেছে, তবে আর কোথাও থেকে এর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য, এই দুটি ছবি বেরোবার ফলে যারা ইউ.এফ.ও.-য় বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বছর দশেক আগে পর্যন্ত রেডিয়ো তরঙ্গের সাহায্যে অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা চালিয়েছিলাম, এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলাম। একটা বিশেষ কারণে এই কাজ আমাকে বন্ধ করতে হয়। সেই কারণটা বলি।

দশ বছর আগে জেনিভাতে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয়, যেখানে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগস্থাপন। আমি সেখানে আমার গবেষণার কথাটা একটা

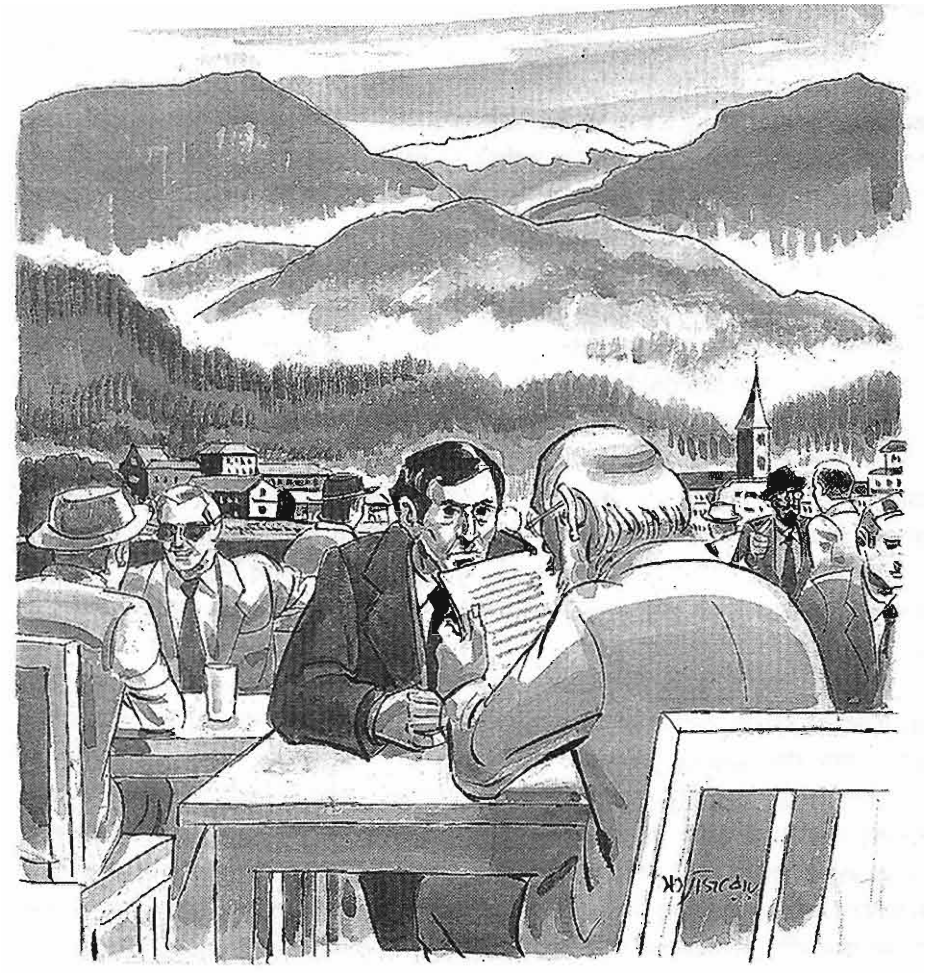

লিখিত বক্তৃতা প্রকাশ করি। জ্ঞানী গুণী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই আমার লেখাটার খুব প্রশংসা করেন। গিরিডিতে বসে আমার সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি যে এই দুরূহ কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি, এতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বক্তৃতার পরের দিন সম্মেলনের অতিথিদের জন্য জিনিভা হ্রদে নৌবিহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। স্টিমারের ডেকে লাঞ্চের জন্য টেবিল পাতা হয়েছে, আমার টেবিলে আমার অনুমতি নিয়ে বসলেন এক ভদ্রলোক। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন, লম্বা একহারা চেহারা, শীর্ণ বিবর্ণ মুখের সঙ্গে মাথার একরাশ মিশকালো চুলে বৈসাদৃশ্যটা বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, তাঁর নাম রোডোল্‌ফো কারবোনি, তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, বাড়ি ইটালির মিলান শহরে। পরিচয় দিয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করে তিনি বেশ দাপটের সঙ্গে আমার টেবিলের উপর রাখলেন।

'কী ব্যাপার ?' আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রথম পাতায় শিরোনামটা পড়লে বুঝতে পারবে,' বললেন ডঃ কারবোনি।

পড়ে তাজ্জব বনে গেলাম। আমার বক্তৃতার যা শিরোনাম, এঁরও ঠিক তাই।

'আপনিও এই একই কাজ করছেন ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ। একই কাজ,' বললেন ডঃ কারবোনি। 'আল্‌ফা সেনটরিকে ঘিরে যে সৌরজগৎ, তারই একটি গ্রহের সঙ্গে রেডিয়ো তরঙ্গ মারফত আমি যোগস্থাপন করেছি। তোমার ও আমার সাফল্যে কোনও তফাত নেই। এই লেখা আমার পড়ার কথা ছিল। তুমি আগে পড়লে, দেখলাম আমি পড়লে তোমার কথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। তাই আর পড়িনি।'

'কিন্তু কেন ? তাতে কি তোমার কৃতিত্ব কিছু কম বলে প্রতিপন্ন হত ? বরং আমাদের বক্তব্য আরও জোরদার হত। অন্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হত।'

'না। তা হত না। লোকে বলত, আমি অসদুপায়ে তোমার কৃতিত্বে ভাগ বসানোর চেষ্টা করছি। তোমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তোমার কপালের জোর আছে, তা ছাড়া তোমার দেশ বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে, তাই সে দেশের মানুষ হয়ে তোমার কৃতিত্ব পশ্চিমে আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাকে তো বিশেষ কেউ চেনে না। আমার কথা লোকে শুনবে কেন ?'

কথাগুলো বলে তার কাগজ নিয়ে কারবোনি উঠে চলে গেল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমার আগে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেলে কারবোনির আর অভিযোগের কোনও কারণ থাকত না। আমি জানি, এই ধরনের ঈর্ষায় মানুষের শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না ; অথচ দুঃখের কথা এই যে, অনেক বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকও এই রিপুর বশবর্তী হয়ে অনেক রকম দুষ্কর্ম করে ফেলেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই আমি অন্তত চারজনের নাম করতে পারি, যাঁদের মাৎসর্যের ঠেলা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে।

কারবোনি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। সে দিনই সন্ধ্যায় আমার বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের কাছে তার কথা শুনলাম, এবং সেটা শোনার পরেই স্থির করলাম যে, অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা আমি বন্ধ করব।

রোডোল্‌ফো কারবোনি যুবাবয়সে ছিল আর্কিটেক্ট। টুরিন শহরে ইটালিয়ান সরকার একবার একটি স্টেডিয়াম তৈরি করার পরিকল্পনা নেন। দেশের সেরা আর্কিটেক্টদের কাছ থেকে নকশা চাওয়া হয়। কারবোনিও একটি নকশা তৈরি করে। তার এক কাকা ছিলেন সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর একজন। এই খুঁটির জোরে কারবোনি কাজটা পেয়ে যায়। তার নকশা অনুযায়ী স্টেডিয়ামের কাজ খানিক দূর অগ্রসর হওয়ার পরই তাতে ফাটল ধরে। তখন কারবোনিকে বাতিল করে অন্য একজন আর্কিটেক্টকে সে কাজে লাগানো হয়। এর ফলে কারবোনির হয় চরম বদনাম। তাকে স্থাপত্যের পেশা ছাড়তে হয়। দুবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয়নি। তারপর বছর আষ্টেক তার আর কোনও খবর পাওয়া যায় না। অবশেষে একদিন সে পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সব শুনেটুনে ভদ্রলোকের প্রতি আমার একটা অনুকম্পার ভাব জেগে ওঠে। গবেষণার বিষয়ের অভাব নেই। ওই একটি বিষয় বাদ দিলে আমি দেউলে হয়ে যাব না। আমি কারবোনিকে চিঠি লিখে আমার এই বিশেষ গবেষণাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই। তার কাজ সে চালিয়ে যেতে পারে, এবং আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাববার আর কোনও কারণ নেই।

এই চিঠির কোনও জবাব কারবোনি দেয়নি। স্বভাবতই এই ইউ.এফ.ও.-র আবির্ভাবের পর তার কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল। সে কি এখনও তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ? এই রকেটটির সঙ্গে কি সে যোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে ?

১৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক পুরনো বন্ধু এসে হাজির। শ্রীমান নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। এঁর অকস্মাৎ লব্ধ আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। ইনি মাকড়দায় থাকেন, মাস তিনেক অন্তর অন্তর একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যান। টেলিপ্যাথি, থটরিডিং, ক্লেয়ারভয়েন্স, অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি অনেক গুণ আছে এঁর। এমনকী, মনগড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, এবং মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পারেন। দুর্লভ ক্ষমতা, বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা এখনও সম্ভব হয়নি, যদিও ভবিষ্যতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ব্রেজিলে আমাদের চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন নকুড়বাবু, তাই এঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তা ছাড়া বয়স আমার অর্ধেক হলেও, এমন ক্ষমতার জন্য এঁকে সমীহ না করে পারি না। অত্যন্ত অমায়িক মানুষ, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, তবে আসলে যে যথেষ্ট উপস্থিতবুদ্ধি রাখেন, তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

সকাল সাড়ে সাতটায় এসে পরম ভক্তিভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ভদ্রলোক বসলেন আমার সামনের সোফাতে। প্রহ্লাদকে আরেক পেয়ালা কফি আনতে দিয়ে হাত থেকে খবরের কাগজটা রেখে বললাম, 'কেমন আছেন বলুন।'

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, 'আমাকে তুমি করে বললে কিন্তু আমি অনেক বেশি খুশি হব স্যার। আপনি আমার বাপের বয়সী!'

'বেশ তো, তাই হবে'খন। কেমন আছ বলো। কী করছ আজকাল?'

'আছি ভালই স্যার। আজকাল একটু পড়াশুনো করার চেষ্টা করছি। বই কিনে যে পড়ব, সে সামর্থ্য তো নেই, তবে উকিল চিন্তাহরণ ঘোষালমশাই অনুগ্রহ করে তাঁর লাইব্রেরিটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বাবা হোমিওপ্যাথি করেন তো?—চিন্তাহরণবাবুর গেঁটেবাত বাবার ওষুধে সেরে গেসল। তাই ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমাকে দুপুরবেলাটা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বসে বই পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। সাত হাজার বই, স্যার। এমন কোনও বিষয় পাবেন না, যার বই নেই ওঁর সংগ্রহে।'

'কী বিষয় পড়ছ?'

'ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী—এই সবই মেইনলি। হয় কী, মাঝে মাঝে সব ঘটনা দেখতে পাই চোখের সামনে, বুঝতে পারি পুরনো যুগের ঘটনা। ইতিহাস পড়া থাকলে, বা দেশ বিদেশ সম্বন্ধে জানা থাকলে হয়তো ঘটনাগুলো চিনতে পারতুম। তাই একটু ওই সব পড়ার চেষ্টা করছি। অবিশ্যি আপনার কাছে এসে বললে হয়তো আপনিও বলে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তো ব্যস্ত মানুষ, তাই আপনাকে এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে ত্যক্ত করতে মন চায় না।'

'বই পড়ে সুবিধে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে খানিকটা হচ্ছে স্যার। দু'মাস আগে ৪ঠা শ্রাবণ একটা দৃশ্য দেখলুম। বীভৎস দৃশ্য ; একজন দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা লোক বসে আছে, তার গায়ে অনেক গয়নাগাটি, তার সামনে এনে রাখা হল একটা থালা। থালার উপর একটা নকশা করা কাপড়ের ছাউনি, সেটা তুলে দেখানো হল, তাতে রাখা আছে একটা মানুষের মুণ্ডু—এই সবেমাত্র কোপ মেরে ধড় থেকে আলগা করা হয়েছে সেটাকে।'

'আওরঙ্গজেবের ঘটনা কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। বই পড়ে তাই তো মনে হয়। আর মুণ্ডুটা তাঁর দাদা দারা শিকোর।'

'হুঁ, আমিও জানি ঘটনাটা।'

'কিন্তু স্যার, সব ঘটনা তো চিনতে পারি না। পরশু যেমন দেখলুম একটা ঘড়ি।'

'ঘড়ি ?'

'হ্যাঁ স্যার। তবে যেমন তেমন ঘড়ি নয়। এমন ঘড়ির কোনও ছবিও দেখিনি কোনও বইয়ে।'

আমি বললাম, 'আমাকে একবার দেখাতে পারবে দৃশ্যটা ?'

'কেন পারব না স্যার ? তবে মিনিটতিনেক সময় দিতে হবে।'

'তা বেশ তো, নাও না সময়।'

'আপনি ওই ফুলের টবটার দিকে চেয়ে থাকুন। আমাকে অবিশ্যি একটু চোখ বন্ধ করতে হবে।'

তিন মিনিটও লাগল না। ঘর জুড়ে চোখের সামনে মসলিনের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখার মতো ফুটে উঠল যে ছবি, সেটা একাদশ শতাব্দীর চিনের কাইফেং শহরে সু সুং-এর তৈরি ওয়াটর ক্লক বা জল ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সম্রাট শেন জুং-এর স্মৃতির উদ্দেশে এই আশ্চর্য ঘড়ি তৈরি করেছিল সু সুং।

মিনিটখানেকের মধ্যেই দৃশ্য আবার মিলিয়ে গেল। নকুড়বাবুকে বলাতে ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। —'দেখুন ! আপনার কাছে কি সাধে আসি ? আপনার এত জ্ঞান, এত ইয়ে !'

এসব কথা অন্যের মুখে আদিখ্যেতা মনে হলেও নকুড়বাবুর মুখে মনে হয় না।

এবার কৌতূহলবশত ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। বললাম, 'তুমি কাগজ পড় ?'

নকুড়বাবু জিভ কেটে সলজ্জ হেসে মাথা নেড়ে 'না' বোঝালেন। আমি বললাম, 'তা হলে তো ইউ.এফ.ও-র ব্যাপারটা জানবে না তুমি।'

'কীসের ব্যাপার স্যার ?'

আমি ঘরের কোণে টেবিলের উপর রাখা কাগজের স্তূপ থেকে ৩রা সেপ্টেম্বরের কাগজটা বার করে ভদ্রলোককে ইউ.এফ.ও-র ছবিটা দেখালাম। তাতে প্রতিক্রিয়া হল অদ্ভুত। ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আরে, ঠিক এই জিনিসটাই যে দেখলুম সেদিন !'

'কোথায় দেখলে ?'

'দুপুরে ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে একটু জিরোচ্ছি, সামনে একটা সজনে গাছের ডালে একটা কাঠবিড়ালির দিকে চোখ গেছে, এমন সময় সব কেমন ধোঁয়াটে হয় এল। দৃশ্য বদলে গেছে কি না বুঝতে পারছি না। তারপর ক্রমে বুঝতে পারলুম যে, বালিতে ছেয়ে গেছে চারদিক। তাই ওরকম ধোঁয়াটে ভাব। ক্রমে বালি সরে গেলে পর দেখলুম ওই জিনিসটাকে—পেল্লায় বড়—বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দুপুরের রোদে ধাতুর তৈরি দেহ থেকে ঝিলিক বেরুচ্ছে।'

'লোকজন কাউকে দেখলে ?'

'আজ্ঞে না, কাউকে না। দেখে মনে হল না কেউ যেন আছে তাতে। অবিশ্যি থাকতেও পারে। আর জায়গাটা মরুভূমি বলে মনে হল। পিছনে পাহাড়, তার চুড়োয় বরফ। এ আমার পষ্ট দেখা।'

নকুড়বাবু আরও মিনিটদশেক ছিলেন। যাবার সময় বললেন, তাঁর মন বলছে তাঁকে আবার আসতে হবে—'কিছু মনে করবেন না তিলুবাবু, আপনার বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমার মনটা উতলা হয়ে ওঠে।'

'সেরকম আশঙ্কা দেখছ নাকি এখন ?'

'এখন না—তবে ঘরে ঢুকেই আপনাকে দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। এক পলকের জন্য যেন দেখলুম আপনি একটা ঘরে বন্দি হয়ে আছেন।'

'তোমার নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ তো ? আমার মতো বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু তোমার যে বিশেষ ক্ষমতা, সেটা খুব কম লোকের মধ্যেই থাকে। এই ক্ষমতাটাকে কোনওমতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।'

'আজ্ঞে সে তো আমিও বুঝতে পারি। তাই নিয়মিত ব্রাহ্মীশাকটা খেয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ, কিন্তু যদি কখনও মনে হয়, কোনও কারণে ক্ষমতা কমে আসছে, তা হলে আমাকে জানিও। আমার একটা ওষুধে তোমার কাজ দিতে পারে।'

'কী ওষুধ ?'

'নাম সেরিব্রিলান্ট। মাথাটা পরিষ্কার ও অনুভূতিগুলোকে সজাগ রাখে।'

নকুড়বাবু যাবার সময়ও বলে গেলেন যে, কোনও প্রয়োজনে তাঁকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই তিনি চলে আসবেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর

এক হৃদয়বিদারক সংবাদ আমার মন থেকে ইউ.এফ.ও.-র সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়েছে।

গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পার্থেনন ধ্বংস হয়ে গেছে। কথাটা নিজেই লিখে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। পার্থেনন আর নেই? অ্যাথেনস শহরের মধ্যে অ্যাক্রোপোলিস পাহাড়ের উপর দু'হাজার বছর আগের তৈরি এই মর্মরপ্রাসাদ, পুরাকালে যা ছিল দেবী অ্যাথিনার মন্দির—ফিডিয়াস, ইকটিনাস, ক্যালিক্রেটিস ইত্যাদি মহান গ্রিক ভাস্কর ও স্থপতির নাম যার সঙ্গে জড়িত, যার অতুল সৌন্দর্যের সামনে পড়ে মানুষের মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় ভরে আসে, সেই পার্থেনন আর নেই, এটা যেন মন কিছুতেই মানতে চায় না।

অথচ খবরটা সত্যি। রেডিয়ো টেলিভিশন ও খবরের কাগজ মারফত খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সবার মনে হাহাকার তুলেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনাটা ঘটে মাঝরাত্রে। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দে অ্যাথেনবাসীর ঘুম ভেঙে যায়। স্বভাবতই প্রায় সকলেই তাদের ঘরের বাইরে চলে আসে। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। যারা অ্যাক্রোপোলিসের কাছে থাকে, তারা চাঁদের আলোয় দেখে পাহাড়ের উপর তাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীকটি আর নেই। তার জায়গায় পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ শ্বেতপাথরের টুকরো। কোনও সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে শক্তিশালী বিস্ফোরকের সাহায্যে কাজটা সম্ভব কি না সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

আজ আর কলম সরছে না। লেখা শেষ করি।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আজ এক অদ্ভুত চিঠিতে মনটা আবার ইউ.এফ.ও.-র দিকে চলে গেছে।

আমার জার্মান বন্ধু উইলহেল্‌ম ক্রোল সম্প্রতি সরকারি আমন্ত্রণ পেয়ে চিন সফরে গিয়েছিল। সে খবর সে আমাকে আগেই দিয়েছে। সিংকিয়াং অঞ্চলে বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখা ছিল এই সফরের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। পিকিং থেকে ক্রোল একটি চিন প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সঙ্গে চলে যায় সিংকিয়াং। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিখ্যাত পর্যটক স্যর অরেল স্টাইন-ও গিয়েছিলেন সিংকিয়াং-এ। তখন এই অঞ্চলকে বলা হত চিন-তুর্কিস্তান। তাকলা-মাকান মরুভূমির দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে টুন হুয়াং শহরের কাছে মাটি খুঁড়ে অরেল স্টাইন এক আশ্চর্য বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি একটা প্রাচীন পুঁথি থেকে চিন প্রত্নতাত্ত্বিকরা অষ্টম শতাব্দীর আর একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের কথা জেনেছেন, যেটা সম্ভবত এই তাকলা মাকানের মধ্যে বালির তলায় কোথাও লুকিয়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক দল সিংকিয়াং-এর খোটান শহরকে কেন্দ্র করে তাকলা-মাকানে খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রোল আছে এই দলের সঙ্গে। ক্রোলের এই চিঠিতে অবিশ্যি প্রত্নতত্ত্বের কোনও উল্লেখ নেই। সে লিখেছে—

প্রিয় শঙ্কু,

সম্প্রতি একটি ইউ.এফ.ও.-এর কথা তুমি হয়তো কাগজে পড়েছ। এই বিশেষ মহাকাশযানটি এখন আমি যে অঞ্চলে রয়েছি, তারই কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে বলে আমার বিশ্বাস। গত তিন দিনে দু' বার আমি এটিকে আকাশে দেখেছি। শুধু আমি

নয়, আমার দলের সকলেই দেখেছে। প্রথমবার পশ্চিম দিকে উড়ে যেতে দেখি। তার পরের দিন পশ্চিম থেকে এসে পুবে তিয়েন শান পাহাড়ের দিকে গিয়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটার অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। চিন সরকার আমাদের হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করে দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু আমি একা যেতে চাই না। এই ধরনের অভিযানে আমাদের তিনজনেরই একসঙ্গে থাকা দরকার, যেমন আগেও থেকেছি। তুমি যদি কোনও বিশেষ কাজে ব্যস্ত না থাক, তা হলে আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাও। আমি সন্ডার্সকে লিখছি। যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া যায়, ততই ভাল। এখানে তোমার নাম শিক্ষিত মহলে অনেকেই জানে। সন্ডার্সের নাম হয়তো জানে না, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।

তোমার টেলিগ্রামের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—উইলহেল্‌ম ক্রোল

নকুড়বাবুর বর্ণনার কথা মনে পড়ছে। মরুভূমির মধ্যে রকেট, তার পিছনে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। মরুভূমি যদি তাকলা-মাকান হয়, তা হলে তার উত্তরে তিয়েন শান পাহাড়ের মাথায় বরফ থাকা স্বাভাবিক।

অভিযানের সম্ভাবনায় নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। নকুড়বাবু বলেছিলেন তাঁকে খবর দিতে। আমার মন বলছে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। ক্রোল ব্রেজিলে নকুড়বাবুর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল, সুতরাং তার আপত্তির কোনও কারণ নেই। সন্ডার্সকে একটা টেলিগ্রাম ও নকুড় বিশ্বাসকে একখানা পোস্টকার্ড আজই ছেড়ে দেওয়া দরকার।

১লা অক্টোবর

সন্ডার্স যেতে রাজি হয়েছে। সে সোজা লন্ডন থেকে যাবার ব্যবস্থা করবে। নকুড়বাবুও অবশ্যই যেতে রাজি, কিন্তু আমার উত্তরে তার চিঠিটা একটু বিশেষ রকমের বলে সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি। সে লিখছে—

শ্রীত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরণে সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন—

চিন সফরের প্রাক্কালে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটি যে উদ্দেশ্যে আমাদের পৃথিবীর আকাশে বিচরণ করিতেছে, জানিবেন তাহা আদৌ শুভ নহে। বিশেষত আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির মনে উহা সবিশেষ পীড়ার উদ্রেক করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করিতে পারি তাহা এখনও জানি না। তবে গতবারের ন্যায় এইবারও যদি সহযাত্রীরূপে আপনাদের সঙ্গলাভ করিতে পারি, তবে নিজেকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিব। আপনার আহ্বানে সাড়া না দিবার কোনও প্রশ্ন উঠে না। কবে গিরিডি পঁহুছিতে হইবে জানাইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করিব। ইতি সেবক—

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

পৃথিবীর অনেক জায়গাই দেখার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু চিন-তুর্কিস্তানে যাওয়া হয়নি। অরেল স্টাইন ও স্বেন হেদিনের বর্ণনা পড়া অবধি জায়গাটা সম্বন্ধে একটা গভীর কৌতূহল রয়েছে। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীতেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিন-তুর্কিস্তানের বর্ণনা রয়েছে। তখন সেখানে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর কুবলা খাঁর রাজত্ব। তাকলা-মাকানের মরুভূমির যে বর্ণনা মার্কো পোলোর লেখায় পাওয়া যায়, সে বড় সাংঘাতিক। ইউ.এফ.ও.-র

অধিবাসীদের যদি গা ঢাকা দেওয়ার মতলব থেকে থাকে, তা হলে এই মরুভূমির চেয়ে ভাল জায়গা তারা আর পাবে না।

নকুড়বাবুকে বলতে হবে ভালরকম গরম কাপড় সঙ্গে নিতে, কারণ অক্টোবরে এই অঞ্চলে দারুণ শীত।

৯ই অক্টোবর, খোটান

এখানে পৌঁছোনোমাত্র সন্ডার্সের কাছ থেকে শোনা দুটো খবর আমাকে একেবারে মুহ্যমান করে দিয়েছে। সব সময়েই দেখেছি, নতুন জায়গায় এলে আমার দেহমন দ্বিগুণ তাজা হয়ে যায়। এবারে এই খবরের জন্য আমার মন ভেঙে গেছে, হাত পা অবশ হয়ে গেছে।

গত চারদিনের মধ্যে মানুষের আরও দুটি কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। এক হল প্যারিসের এইফেল টাওয়ার, আর আরেক হল ক্যামবোডিয়ায় অবস্থিত আংকোর ভাটের সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ। আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে এই বৌদ্ধস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্যারিসের ঘটনাটা ঘটে অমাবস্যার মাঝরাত্রে। এইফেল টাওয়ার মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ার শব্দে সারা প্যারিস শহরের ঘুম ভেঙে যায়। টাওয়ারের আশেপাশে কোনও বসতি না থাকার ফলে লোক মারা গিয়েছিল শুধু তিনজন রাত জাগা মাতাল। কিন্তু তাদের প্রিয় লৌহস্তম্ভের এই দশা দেখে পরদিন সারা প্যারিস শহর নাকি কান্নায় ভেঙে পড়ে। যেখান থেকে টাওয়ারটি ভেঙেছে, সেই অংশের লোহার অবস্থা দেখে নাকি মনে হয় কোনও প্রচণ্ড শক্তিশালী রশ্মিই এই ধ্বংসের কারণ। অনেকেই অবিশ্যি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছে ওই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটিকে, যদিও সেদিন আকাশে মেঘ থাকার ফলে ওই বস্তুটিকে দেখা যায়নি।

আংকোর ভাট ধ্বংস হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্তূপটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। ঘটনা ঘটেছে বিকেলে। বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি ; শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, স্তূপ এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। সমস্ত সৌধটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

চিন প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডঃ শেং অতি চমৎকার লোক। বয়স চল্লিশ, তবে দেখে আরও কম মনে হয়। খোটানে থাকার ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছেন, এবং রকেট অনুসন্ধানের ব্যাপারে তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলেছেন। কিন্তু ক্রোল ও সন্ডার্সকে দেখে মনে হচ্ছে, দুজনেই যেন বেশ ভয় পেয়েছে। ডিনারের সময় সন্ডার্স বলল, 'এই ধ্বংসের জন্য যদি ওই রকেট দায়ী থাকে, তা হলে বুঝতে হবে অসাধারণ শক্তিশালী কোনও বিস্ফোরক যন্ত্র রয়েছে ওদের হাতে। সেখানে আমরা কী করতে পারি বলো ? আমাদের দিক থেকে কোনও আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা তো সহজ ব্যাপার নয় ! রকেটটা কোথায় রয়েছে, সেটাই এখনও জানি না আমরা। অথচ আরও কত কী যে ক্ষতি করতে পারে এরা, তাও জানা নেই। সুতরাং...'

ক্রোলও সায় দিচ্ছে দেখে আমি আমার মনের ভাবটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

'যে সব জিনিস নিয়ে সভ্য মানুষ গর্ব করে, একটির পর একটি করে সে জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটাই যদি তোমরা ভেবে থাক, তা হলে আমি তোমাদের দলে নেই। আমি তা হলে একাই যাব তাকলা-মাকানে এই শয়তানদের সন্ধানে। আমি জানি না ডঃ শেং কী বলেন, কিন্তু—'

আশ্চর্য এই যে শেং আমার কথায় তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন

করলেন। বললেন, 'ফিউড্যাল যুগে শ্রমিকদের খাটিয়ে এই সব সৌধের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমি জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের মাহাত্ম্য আমরা অস্বীকার করি না। চিনের সমস্ত প্রাচীন শিল্পের নির্দশন আমরা সযত্নে রক্ষা করেছি। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে আরও প্রাচীন শিল্প আমরা আবিষ্কার করতে পারি। এই নৃশংস ধ্বংসকার্য প্রতিরোধ করা আমাদের কর্তব্য।'

গলায় কম্ফর্টার ও গায়ে তুলোর কোটে জবুথবু নকুড়বাবু এবার মুখ খুললেন।

'তিলুবাবু, আপনি কাইন্ডলি এঁদের ইংরিজি করে বলে দিন যে, আমার মন বলছে, আমাদের জয় অনিবার্য। অতএব পিছিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না।'

মাকড়দা থেকে আসার পথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক কুলির মাথায় চাপানো স্টিল ট্রাঙ্কের ধাক্কা খেয়ে নকুড়বাবুর মাথার বাঁ দিকে একটা জখম হয়েছে। ক্ষতস্থানে এখন স্টিকিং প্লাস্টার। ভয় ছিল এতে ভদ্রলোকের বিশেষ ক্ষমতা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন তার জোর দিয়ে বলা কথাগুলো শুনে কিঞ্চিৎ ভরসা পেলাম। কিন্তু তার কথা ইংরিজি করে বলাতে দেখলাম, ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনেই নকুড়বাবুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিল। বুঝলাম, তারা মানতে চাইছে না ভদ্রলোকের কথা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটে হার হল, দুই সাহেবের। ঠিক হল কাল সকালেই আমরা হেলিকপ্টারে রওনা দেব উত্তর মুখে তাকলা-মাকান পেরিয়ে তিয়েন শান পর্বতশ্রেণীর উদ্দেশে।

১০ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে আটটা

তাকলা-মাকানের অন্তহীন বালুতরঙ্গের উপর দিয়ে আমাদের ছয়জন যাত্রিবাহী হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে। আমি তারই মধ্যে বসে ডায়েরি লিখছি। মার্কো পোলো লিখেছিলেন, লম্বালম্বিভাবে এই মরুভূমি পেরোতে লাগে এক বছর ; আর যেখানে মরুভূমি সবচেয়ে অপ্রশস্ত, সেখানেও পেরোতে লাগে এক মাস। আড়াই হাজার ফুট উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ভেনিশীয় পর্যটক খুব ভুল বলেননি। এই মরুভূমিরই স্থানে স্থানে একেকটি ওয়েসিস বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সব শহর—খোটান, কাশগার, ইয়ারকন্দ, চেনচের, আক্সু। সিংকিয়াং-এর অধিবাসীরা অধিকাংশই উইগুর শ্রেণীর মুসলমান, তাদের ভাষা তুর্কি। সিংকিয়াং-এর দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে হল কাশ্মীর, তারপর আরও পশ্চিমে আফগানিস্তান, তারপর সোভিয়েত রাশিয়া, আর তারপর একেবারে পুবে মোঙ্গোলিয়া।

ডঃ শেং আমাদের হেলিকপ্টারের জানলা দিয়ে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন, আর সেই সঙ্গে চিন-তুর্কিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন।

ক্রোল আর সন্ডার্স যেন আজ অনেকটা স্বাভাবিক। আমি জানতাম দিনের আলোতে এদের মনের সংশয় ও শঙ্কার ভাব অনেকটা কমে যাবে। এরা দুজনেই যে সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় সেটা তো আমি খুব ভাল করেই জানি। তবে বর্তমান অভিযানের একটা বিশেষ দিক আছে, যেটা মনে খানিকটা ভীতির সঞ্চার করতে পারে, এবং সেটার মূলে হল আমাদের জ্ঞানের অভাব। অন্য গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। এরা কেমন লোক, এদের আদৌ 'লোক' বলা চলে কি না, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলোর জন্য যদি এরাই দায়ী হয়, তা হলে এদের আক্রোশের কারণ কী, মানুষের কীর্তির উপর আক্রোশ মানে কি মানবজাতির উপরেই আক্রোশ—এ সব তো কিছুই জানা নেই! তাই একটা দুশ্চিন্তা যে আমার মনেও নেই তা বলব না। সংগ্রামটা কি সত্যিই একেবারে একপেশে হতে চলেছে?

আমরা কি জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ালাম ?

নকুড়বাবুকে আজ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ বলে মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করাতে বললেন ভালই আছেন, মাথার জখমটাও আর কোনও কষ্ট দিচ্ছে না, কিন্তু আমার যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। সবচেয়ে চিন্তিত হলাম যখন ভদ্রলোক হঠাৎ একবার প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কোথায় চলেছি, তিলুবাবু ?'

কিন্তু আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে মিনিটখানেক চেয়ে থাকাতে হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, 'ও হো হো—সেই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু—তাই তো ?'

ভদ্রলোককে এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট খাইয়ে দিলে বোধ হয় ভাল হবে।

উত্তরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার এদিকে দেখা যাচ্ছে একটা বিস্তীর্ণ জলাশয়। শেং বললেন, ওটা বাঘশার নোল—অর্থাৎ বাঘশার লেক।

আমরা এই ফাঁকে কফি আর বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি। আমাদের পাইলটটি চৈনিক—নাম সু শি। সে ইংরাজি জানে না, তার হয়ে শেং-কে দোভাষীর কাজ করতে হয়। মাঝে মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া চিনা গান শুনতে পাচ্ছি পাইলটের গদি থেকে, হেলিকপ্টারের পাখার শব্দ ছাপিয়ে সে গান পৌঁছাচ্ছে আমাদের কানে।

ক্রোল সবে পকেট থেকে একটি খুদে চেসবোর্ড বার করেছে সন্ডার্সের সঙ্গে খেলার মতলবে, এমন সময় শেং উত্তেজিত হয়ে জানলার দিকে হাত বাড়াল।

বিকেল সাড়ে চারটা

আমরা মাটিতে নেমেছি। আমাদের তিনদিকে ঘিরে আছে অনুচ্চ পাথরের ঢিবি। উত্তরে ঢিবির উচ্চতা কোনওখানেই ৬০-৭০ ফুটের বেশি নয়। তারই পিছনে শেং-এর নির্দেশে হেলিকপ্টার থেকে মাটিতে চারটে গভীর গর্ত দেখতে পেয়ে আমরা নামার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাছ থেকে দেখে বুঝেছি, এই চারটে গর্ত যে ইউ.এফ.ও.-র চারটে পায়ার চাপে হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পায়ার পরস্পর দূরত্ব থেকে রকেটটিকে বেশ বড় বলেই মনে হয়—একটা বেশ বড়সড় বাড়ির মতো। তবে সেটা যে এখন কোথায় সেটা জানার কোনও উপায় নেই। সু শি একাই হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিল আশপাশের অঞ্চলটা একটু ঘুরে দেখতে, কিন্তু প্রায় দুশো মাইল পরিক্রমা করেও কিছু দেখতে পায়নি।

আমরা এখন একটা ফুট পঞ্চাশেক উঁচু পাথুরে ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিয়েছি। জমি এখানে মোটামুটি সমতল, এবং বালি থাকা সত্ত্বেও বেশ শক্ত। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে ছোট বড় পাথরের খণ্ড। প্লাস্টিকের তাঁবু রয়েছে আমাদের সঙ্গে ; তিনটি তাঁবু হবে ছ'জনের বাসস্থান। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, ধৈর্যের প্রয়োজন হবে, আর এটাও জানি যে, সহজে হাল ছাড়া চলবে না।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—যদি সেই রকেট এখানে এসে নামে, তা হলে তার বাসিন্দাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করব আমরা, বা তাদের কাছ থেকে কীরকম ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। ক্রোল বলল, 'যারা পার্থেনন ধ্বংস করতে পারে, তাদের সঙ্গে কথা বলার আগেই তোমার উচিত তাদের অ্যানাইহিলিন দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।'

আমার অ্যানাইহিলিন অস্ত্রে যে কোনও গ্রহের প্রাণীই যে নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এই ভিন্‌গ্রহবাসীরা মানুষের প্রতি কোনও বৈরিভাব পোষণ করে না, এবং এই ধ্বংসের কাজগুলো আসলে তারা করছে না, তার জন্য দায়ী অন্য কেউ। ভারী আশ্চর্য লাগে এই ধ্বংসের ব্যাপারটা। অন্য গ্রহ থেকে

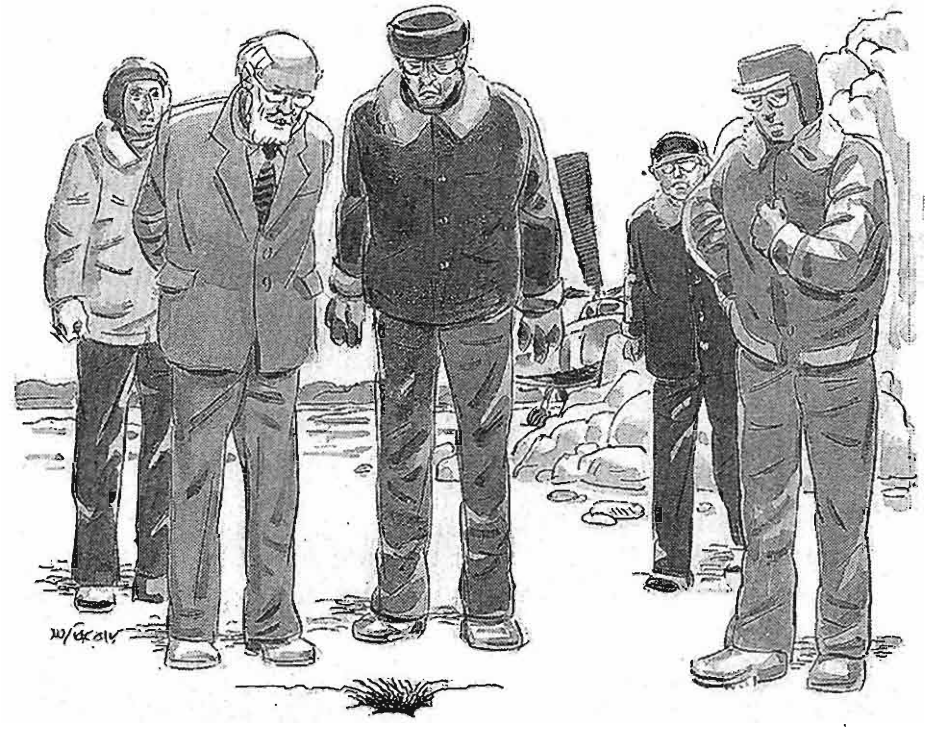

কোনও প্রাণী যে ঠিক এমন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে, মন সেটা মানতে চায় না কিছুতেই।

সন্ডার্সকে কথাটা বলতে সে বলল, 'যে কোনও উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসে থাকুক, তাদের সঙ্গে যখন কথা বলা সম্ভব নয়, তখন তাদের উদ্দেশ্যটা যে কী সেটা আমরা জানতেও পারব না। সুতরাং রিস্ক নিয়ে কাজ কী ? তারা কিছু বলার আগে তাদের শেষ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ ব্যাপারে আমি ক্রোলের সঙ্গে একমত।'

সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি করেই যদি অন্য গ্রহের প্রাণী থেকে থাকে এই রকেটে, তা হলে তাদের দর্শন পাওয়ার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করাটা একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটা সুযোগ এসেছে। ঈজিপ্টে যে মহাকাশযান এসে নেমেছিল তাতে কোনও প্রাণী ছিল না। এটাতেও থাকবে না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং প্রাণের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া চলতে পারে না কোনওমতেই।

শেং-ও দেখলাম আমার সঙ্গে একমত। রকেট চিনের মাটিতে এসে নেমেছে বলে হয়তো তার আগ্রহটা একটু বেশি। সে ও বলল যে, এরা যদি সত্যিই হিংসাত্মক ভাব নিয়ে আসত, তা হলে এরা মানুষের কীর্তি নষ্ট করার আগে মানুষের উপরেই আক্রমণ চালাত।

নকুড়বাবু এতক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এরা তো নেই !'

'কারা নেই ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'অন্য গ্রহের প্রাণী', বললেন নকুড়বাবু।

'তারা নেই মানে ? তারা ছিল না কোনও সময়ই ?'

'ছিল। ইউ.এফ.ও.-তে ছিল।'

'তা হলে গেল কোথায় ?'

নকুড়বাবু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ থেকে বললেন, 'মাটির তলায়।'

'মাটির তলায় ?' ক্রোল ও সন্ডার্স একসঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, মাটির তলায়।'

'তবে রকেটে কে আছে ? নাকি রকেটই নেই ?'

'না না—রকেট আছে বইকী,' বললেন নকুড়বাবু। 'তবে তাতে অন্য গ্রহের কোনও প্রাণী নেই।'

'তবে কী আছে ?'

'যন্ত্র আছে।'

'কম্পিউটার ?' শেং জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, কম্পিউটার। আর—'

'আর কী ?'

আমরা চারজনেই উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু নকুড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'হারিয়ে গেল।'

'কী হারিয়ে গেল ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। হারিয়ে গেল। মাথাটা এখনও ঠিক...'

আমি ভদ্রলোককে এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট খাইয়েছি আজ দুপুরেই। বুঝলাম, সেটা এখনও পুরোপুরি কাজ দেয়নি।

নকুড়বাবু চুপ করে গেলেন।

সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বেড়েছে।

একটা শব্দ আসছে কোথা থেকে ?

সকলেই শুনেছে সেই শব্দ। আর লেখা চলবে না।

১১ই অক্টোবর, রাত ন'টা

রকেটে বন্দি অবস্থা। আমরা পাঁচজনে। সু শি হেলিকপ্টারের ভিতরেই ঘুমোচ্ছিল ; সে বাইরেই রয়ে গেছে। তার পক্ষে আমাদের মুক্তির কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কি না জানি না। আমাদেরও কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হবে জানি না। এখন একটা বোকা বনে যাওয়ার অবস্থা ; যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘটনাটা খুলেই বলি।

কাল সন্ধ্যায় হাজার ভিমরুলের সমবেত গুঞ্জনের মতো শব্দটা পাবার মিনিটখানেকের মধ্যেই মেঘের ভিতর থেকে ইউ.এফ.ও.-র আবির্ভাব হল। যেমন ছবি দেখেছিলাম, আকারে ঠিক তেমনই তবে সর্বাঙ্গ থেকে যে স্নিগ্ধ কমলা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেটা আর খবরের কাগজের সাদা কালো ছবিতে কী করে ধরা পড়বে ? সামনে থেকে দেখে বুঝতে পারছি, চেহারাটা একটা অতিকায় শিরস্ত্রাণের মতো। সর্বাঙ্গে গবাক্ষ বা পোর্টহোলের বুটি, এখান সেখান থেকে শিং-এর মতো জিনিস বেরিয়ে আছে—যেগুলোর নিশ্চয়ই কোনও ব্যবহার আছে। রকেটটা মনে হয় আমাদের দিকেই আসছে ; সম্ভবত যেখানে পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানেই নামবে। আমরা জিনিসটাকে দেখছি পাথরের প্রাচীরের উপর দিয়ে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে, যতটা সম্ভব নিজেদের অস্তিত্ব জানান না দিয়ে। তবে এটা জানি যে, রকেটের

অধিবাসীরা আমাদের দেখতে না পেলেও, হেলিকপ্টারটা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তার ফলে তারা কী করতে পারে সেটা জানা নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই রকেটটা যথাস্থানে নামল।

আমরা ক'জন নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় দশ মিনিট ধরে রকেটটার দিকে চেয়ে থাকলেও ভিনগ্রহের প্রাণীদের দিক থেকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এবার তা হলে কী করা ?

শেং-ই প্রথম প্রস্তাব করল রকেটটার দিকে এগিয়ে যাবার। কাঁহাতক অনন্তকাল ধরে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায় ? আমার পকেটে অ্যানাইহিলিন আছে, সন্ডার্স ক্রোল দু'জনের কাছেই রিভলভার রয়েছে। কেবল নকুড়বাবু আর শেং-এর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। দু'জন সাহেবই ইতিমধ্যে স্নায়ু মজবুত করার জন্য বড়ি খেয়ে নিয়েছে, তাই বোধ হয় তারা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

আমরা পাঁচজনে পাথরের গা বেয়ে নেমে সমতল ভূমি দিয়ে চার পায়ে দাঁড়ানো রকেটটার দিকে অগ্রসর হলাম। কারিগরিতে এই ছিমছাম সুদৃশ্য রকেটের তুলনা নেই, সেটা এখন ভাল করে দেখে বেশ বুঝতে পারছি। টেকনলজির সঙ্গে শিল্পবোধের সমন্বয় না হলে এমন মহাকাশযানের সৃষ্টি হতে পারে না।

নকুড়বাবু হঠাৎ বললেন, 'অদ্ভুত জায়গা বেছেছে ইউ.এফ.ও.।'

আমি বললাম, 'তা তো বটেই ; তাকলা-মাকানের এক প্রান্তে তিয়েন শান পাহাড়ের ধারে—আত্মগোপন করার প্রশস্ত জায়গা।'

'আমি তার জন্য বলছিলাম না।'

'তবে ?'

কিন্তু নকুড়বাবু আর কিছু বলার আগেই ক্রোল চাপা গলায় একটা মন্তব্য করল—

'দ্য ডোর ইজ ওপ্ন।'

সত্যিই তো ! রকেটের এক পাশে একটা প্রবেশদ্বার খোলা রয়েছে, এবং তার থেকে অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় কোনও ধাতুর তৈরি একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত।

'চলুন, যাবেন না ?'

এবার কথাটা বললেন নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। তার দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠা বা ভয় কোনওটারই লক্ষণ দেখলাম না।

'ভেতরে যাওয়া নিরাপদ কি ?'

ভদ্রলোককে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'আপদ নিরাপদের কথা কি আসছে, স্যার ?' পালটা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। 'আমাদের আসার কারণই তো হল ইউ.এফ.ও.-র অনুসন্ধান। সেই ইউ.এফ.ও.-র সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খোলা পেয়েও ভেতরে ঢুকব না ?'

এবার শেং বলল 'লেটস গো ইন।'

সন্ডার্স ও ক্রোল মাথা নেড়ে সায় দেওয়াতে পাঁচজনে এগিয়ে গেলাম—আমার হাতে অ্যানাইহিলিন, দুই সাহেবের হাতে দুটি রিভলভার।

পথপ্রদর্শক হয়ে আমিই প্রথম সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম।

একে একে পাঁচজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে রকেটের ভিতর একটা গোল কামরায় প্রবেশ করলাম।

ঘরের বাইরে রাত হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে একটা মোলায়েম নীল আলো, যদিও সেটার উৎস কোথায় বুঝতে পারলাম না। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি, তার বিপরীত দিকে

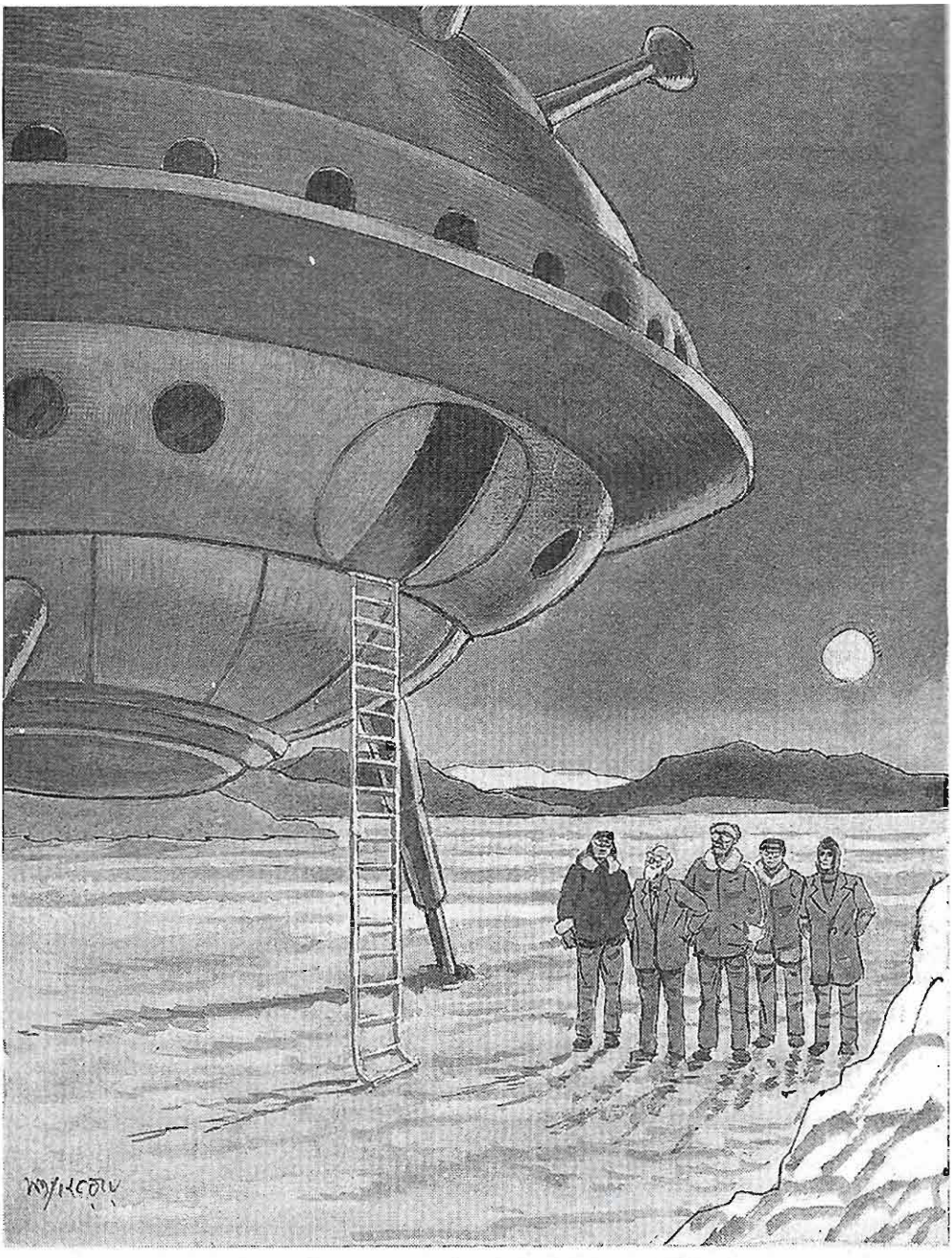

একটা গোল জানালা রয়েছে, যেটা কাচ বা প্লাস্টিক জাতীয় কোনও পদার্থ দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া ঘরের বাঁয়ে ও ডাইনে দুটো গোল দরজা রয়েছে; দুটোই বন্ধ। আসবাব বলতে মেঝেতে খানদশেক টুল জাতীয় জিনিস, যেগুলো বেশ মজবুত অথচ স্বচ্ছ কোনও পদার্থের তৈরি। এ ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। এ রকেটে কোনও ব্যক্তি বা প্রাণী আছে কি না সেটা এ ঘর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।

রকেট কি তা হলে রোবট বা কম্পিউটার দ্বারা চালিত ? যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই দু পাশের দুটো ঘরে রয়েছে, কারণ এ ঘরে কিছুই নেই।

আমরা অবাক হয়ে এদিক, ওদিক দেখছি, এমন সময় একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে।

ক্রোল তৎক্ষণাৎ এক লাফে দরজাটার কাছে গিয়ে সেটার হাতল ধরে প্রাণপণে টানাটানি করলেও কোনও ফল হল না। ও দরজা ওইভাবে খোলা যাবে না। ওর জন্য নিশ্চয়ই একটা সুইচ বা বোতামের বন্দোবস্ত আছে, এবং সে জিনিস এ ঘরে নেই। যিনি টিপেছেন সে বোতাম, তিনি আমাদের বন্দি করার উদ্দেশ্যেই টিপেছেন।

'ওয়েলকাম, জেন্টলমেন !'

হঠাৎ মানুষের গলায় ইংরেজি ভাষা শুনে আমরা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। শেং বাঁ দিকের দেওয়ালের উপর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে।

সেখানে একটা গোল গর্ত, তার মধ্য দিয়েই এসেছে কণ্ঠস্বর। আমার বুকের ভিতর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে গেছে এক ধাক্কায় অনেকখানি।

হঠাৎ চেনা লাগল কেন গলার স্বরটা ?

আবার কথা এল পাশের ঘর থেকে।

'অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তোমরা একটু অপেক্ষা করো। তোমাদের ঘরে খোলা জানলা না থাকলেও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও কষ্ট হবে না, অক্সিজেনের অভাব ঘটবে না। তবে ধূমপান নিষিদ্ধ। ক্ষুধাতৃষ্ণাও তোমরা অনুভব করবে না ওই ঘরে। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

কথা বন্ধ হল। কই, এঁকে তো শত্রু বলে মনে হচ্ছে না মোটেই ! আর ইনি যদি মানুষ হন, তার মানে কি অন্য গ্রহ থেকে আসছে না এই রকেট ?

আর ভাবতে পারলাম না। সন্ডার্স ও ক্রোল টুলে বসে কপালের ঘাম মুছছে। তাদের দেখাদেখি আমরা বাকি তিনজনও বসে পড়লাম।

আবার নৈঃশব্দ্য। আমরা যে যার পকেটে পুরে ফেলেছি আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র।

আমি ডায়রি লেখা শুরু করলাম।

কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এইভাবে ? কী আছে আমাদের কপালে ?

১২ই অক্টোবর, সন্ধ্যা ছ'টা

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেনটরির একটি গ্রহ থেকে আসা এই ইউ.এফ.ও.-কে (এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নয়) ঘিরে আমাদের যে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হল, সেটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা গোল ঘরে বসে থাকার পর আবার শুনতে পেলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'লিস্‌ন, জেন্টেলমেন। তোমরা আমাকে না দেখতে পেলেও, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। এই দৃষ্টি সাধারণ চোখের দৃষ্টি নয়। এই রকেটে বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র রয়েছে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেখছি তোমাদের তিনজনের পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সেই তিনটি অস্ত্র পকেট থেকে বার করে তোমাদের সামনে দেয়ালের উপর দিকে যে গোল গর্তটি রয়েছে তার মধ্যে ফেলে দাও। তারপর বাকি কথা হবে।'

আমি কথা শুনেই অ্যানাইহিলিনটা বার করেছি পকেট থেকে, কিন্তু ক্রোল ও সন্ডার্স দেখছি চুপচাপ বসেই আছে। আমি আজ্ঞা পালনের জন্য ইশারা করলাম তাদের দিকে, তবুও

তারা নড়ে না।

'আই অ্যাম ওয়েটিং,' বলে উঠল গমগমে কণ্ঠস্বর।

আমি আবার ইশারা করলাম। তাতে সন্ডার্স চাপা গলায় অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'একটা বুজরুককে অত ভয় পাবার কী আছে ? দিস ইজ নো ইউ.এফ.ও. !'

ঘরের আবহাওয়ায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরকম হল কেন ? সন্ডার্স ও ক্রোলের হাত চলে গেছে তাদের বুকের ওপর। কোমর থেকে দুমড়ে গেছে শরীর। নকুড়বাবু হাঁসফাঁস করছেন। শেং-এর জিভ বেরিয়ে গেছে, মুখ বেঁকে গেছে শ্বাসকষ্টে। সর্বনাশ ! শেষে কি এইভাবে— ?

'ফেলে দাও আগ্নেয়াস্ত্র ! মূর্খের মতো জিদ কোরো না ! তোমাদের মরণবাঁচন এখন আমার হাতে !'

'দিয়ে দিন ! দিয়ে দিন !' রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন নকুড়বাবু।

আমি আগেই উঠে অ্যানাইহিলিনটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে গেছি। এবার সাহেব দুটিও কোনওরকমে উঠে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বার করে গর্তে ফেলে দিলেন। তারপর আমি ফেললাম আমার অ্যানাইহিলিন।

ঘরের আবহাওয়া তৎক্ষণাৎ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

কিছুক্ষণ কথা নেই। আমরা আবার দম ফেলতে পারছি, আবার যে যার জায়গায় এসে বসেছি।

এবার যেদিকে গোল গর্ত, সেদিকেরই গোল দরজাটা দু'ভাগ হয়ে দু' পাশে সরে গেল, আর তার ফলে যে গোল গহ্বরের সৃষ্টি হল তার মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখেছি দশ বছর আগে জেনিভার সেই স্টিমারে।

ইটালির পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ রোডোল্‌ফো কারবোনি।

সন্ডার্স ও ক্রোল দু'জনেই এঁকে এককালে চিনত, দু'জনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিস্ময়সূচক শব্দ।

কারবোনি এখন আরও বিবর্ণ, আরও কৃশ। তার মিশকালো চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে তখন যে নৈরাশ্যের ভাব দেখেছিলাম, তার বদলে এখন দেখছি এক আশ্চর্য দীপ্তি—যেন সে এক অতুল শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী, কাউকে সে তোয়াক্কা করে না।

'ওয়েল, জেন্টলমেন,' দরজার মুখে দাঁড়িয়ে শুরু করল কারবোনি, 'প্রথমেই বলে রাখি যে আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, কাজেই আমার গায়ে হাত তুলতে এসো না।'

আমি সন্ডার্সের দিকে দেখছিলাম, কারণ আমি জানি সে রগচটা মানুষ ; এর আগে বার কয়েক তার মাথা গরম হতে দেখেছি। এখন সে দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। হাত তোলার নিষেধটা মানতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

এবার আমি কারবোনিকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'এই রকেটের মালিক কি তুমি ?'

'আপাতত আমি।'

'আপাতত মানে ? আগে কে ছিল ?'

'যাদের সঙ্গে আমি আজ পনেরো বছর ধরে যোগাযোগ করে আসছি, তারা। এককালে তুমিও করেছিলে। আলফা সেনটরির একটি গ্রহের প্রাণী। তারা যে আসছে, সেকথা তারা আমায় জানিয়েছিল। আমি তাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম।'

'কী ভাষায় ভাবের আদান প্রদান হচ্ছিল তোমাদের মধ্যে ?'

'প্রথমে গাণিতিক ভাষায়, পরে মুদ্রার সাহায্যে। ইচ্ছা ছিল ইংরাজি অথবা ইটালিয়ানটা শিখিয়ে নেব, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।'

'কেন ?'

'এখানে আসার ক' দিন পরেই তারা অসুখে পড়ে।'

'অসুখ ?'

'হ্যাঁ। ফ্লু। পৃথিবীর ভাইরাসের হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি। তিনজন ছিল, তিনজনই মারা যায়। অবিশ্যি আমার কাছে ওষুধ ছিল, কিন্তু সে ওষুধ আমি কাজে লাগাইনি।'

'কেন ?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'কারণ তাদের বাঁচতে দেবার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। তারা ছিল মূর্খ।'

'মূর্খ ?'

'টেকনলজির দিক দিয়ে নয়। সেদিক দিয়ে তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু তারা এসেছিল মানুষের বন্ধু হিসেবে, মানুষের উপকার করতে। আমি

তাদের মনোভাবের সমর্থন করতে পারিনি। অবিশ্যি তারা কিছু করতে পারার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। তাকলা-মাকানের বালির নীচে তিনজনেরই সমাধির ব্যবস্থা করি আমি। মৃত্যুর আগে এই রকেটটা চালানোর প্রক্রিয়া তারা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। জলের মতো সোজা। সমস্তই কম্পিউটারের সাহায্যে চলে। শুধু বোতাম টেপার ব্যাপার। একটা রোবটও আছে, তবে সেটা এখন নিষ্ক্রিয়। তাকে কী করে চালাতে হয় জানি না, আর সেটার প্রয়োজনও নেই, কারণ আমিই এখন সর্বেসর্বা।'

'রকেটের যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখতে পারি কি?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'বুঝতেই পারছ, বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমাদের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল রয়েছে।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

আমরা পাঁচজনেই গোল দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা প্রকাণ্ড। তালে তালে আঘাতের একটা শব্দ পাশের ঘর থেকেই পাচ্ছিলাম, এ ঘরে এসে সেটা আরও স্পষ্ট হল। দূর থেকে জয়ঢাক পেটার শব্দ যে রকম শোনায়, কতকটা সেই রকম। যেদিক দিয়ে ঢুকলাম তার বিপরীত দিকে একটা বেশ বড় স্বচ্ছ জানালা রয়েছে; বুঝলাম, এটাই সামনের দিক।

জানালার দু'দিকে রয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল। তাতে সারি সারি সুইচ বা বোতাম রয়েছে, যার পাশে পাশে বিভিন্ন রকম জ্যামিতিক নকশা থেকে বোঝা যায় কোনটার কী ব্যবহার। ঘরের ডান কোণে স্বচ্ছ উপাদানে তৈরি একটা মস্তকহীন মূর্তি রয়েছে, সেটাই যে রোবট তাতে সন্দেহ নেই। রোবটের দু' পাশে ঝোলা দুটি হাতে ছ'টা করে আঙুল, চোখের বদলে বুকের কাছে রয়েছে একটা হলুদ লেন্স। এ ছাড়া ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। সমস্ত রকেটটার মধ্যেই একটা অনাড়ম্বর সাদাসিধে ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই রকেট কারবোনি কীভাবে ব্যবহার করতে চায়?

ঘরে ফিরে এসে প্রশ্নটা করলাম তাকে।

কারবোনি কথাটার উত্তর দিল একটা ক্রূর হাসি হেসে।

'আপাতত পৃথিবীতে কিছু কাজ আছে। সেগুলো সেরে পাড়ি দেব মহাকাশে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে গেলে রকেট চলবে আলোক তরঙ্গের গতিতে—অর্থাৎ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। যে গ্রহ থেকে এই রকেট এসেছে, সেখানে পৌঁছোতে লাগবে দশ বছর।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! পৃথিবীর উপর তো কোনও আকর্ষণ নেই আমার, মৃত্যুভয়ও নেই। দু'বার এর আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর মায়া অনেকদিন আগেই কাটিয়েছি। কাজেই যাত্রাপথেও যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তা হলে কোনও খেদ নেই।'

'পৃথিবীতে যে কাজের কথা বলছ, সেটা কী?'

'তার একটা কাজ তোমাদের আজকেই করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা জায়গায় বসো, আমি রকেটটাকে চালু করে দিই।'

আমরা বসলাম। কারবোনি পাশের ঘরে গিয়ে আবার গোল দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আধ মিনিটের মধ্যে আমরা শূন্যে উঠতে শুরু করলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম হুহু করে তাকলা-মাকান মরুভূমি ও তিয়েন শান পর্বতশ্রেণীর ব্যাপ্তি বেড়ে গেল, আর তারপর তাদের পিছনে ফেলে দিয়ে আমরা চললাম পশ্চিম দিকে।

রকেটের গতি আন্দাজ করা সহজ নয়, কিন্তু এত উপর থেকে যখন দেখছি পৃথিবীর মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে নীচ দিয়ে, তখন গতি যে সাধারণ জেট প্লেনের চেয়ে অনেক বেশি তাতে

সন্দেহ নেই।

ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে ন'টা। পৌনে দশটার মধ্যে রকেট এত উঁচুতে উঠে পড়ল যে, পৃথিবীর কোন অংশ দিয়ে চলেছি আমরা, সেটা বোঝার আর কোনও উপায় রইল না।

অন্যদের কথা জানি না, একভাবে একটানা উড়ে চলার জন্য আমার একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল ; হঠাৎ কানে তালা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমরা নামতে শুরু করেছি।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মেঘের আবরণ ভেদ করে দেখতে পেলাম, আমরা বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। কোথাকার পর্বতশ্রেণী এটা ?

আমার মনের প্রশ্নের জবাব এল দেওয়ালের গোল গর্তটার ভিতর দিয়ে।

'নীচে যে বরফ দেখছ, সেটা আল্‌পসের।'

'কোথায় যাচ্ছ আমাদের নিয়ে ?' অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল ক্রোল।

উত্তর এল—'আমার দেশে।'

'ইটালি ?'

আর কোনও কথা নেই।

পাহাড় পেরিয়ে রকেট ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করেছে। শহরের আলো দেখা যাচ্ছে নীচে। ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া আলোকবিন্দুর সমষ্টিই জানিয়ে দিচ্ছে শহরের অবস্থিতি। একটা আলোর ঝাঁক মিলিয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আর একটা আলোর ঝাঁক এসে পড়ছে।

এবার রকেটের গতি কমল, আর সেই সঙ্গে মাটির দূরত্বও কমে এল। একটা প্রকাণ্ড শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। শহরের পশ্চিমে জলাশয়। ভূমধ্যসাগর কি ?

'রোম !' চেঁচিয়ে উঠল সন্ডার্স। 'ওই যে কলিসিয়াম !'

হ্যাঁ। এখন স্পষ্টই চিনতে পারছি রোম শহরকে। আমরা পাঁচজনেই এখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

এবার শোনা গেল কারবোনির উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

'শোনো। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষ আমার কী সর্বনাশ করেছিল, শোনো। আমার নকশায় তৈরি টুরিনের স্টেডিয়াম কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ আর্কিটেক্টের ষড়যন্ত্রের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। দোষটা পড়েছিল আমার ঘাড়ে। আমার মানসম্মান ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তার ফলে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমাকে করে দিয়েছে এই ভিনগ্রহের রকেট। কীভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি, সেটা তোমরা আজ চোখের সামনে দেখতে পাবে।'

আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পার্থেনন, এইফেল টাওয়ার, আংকোর ভাট—এই সব ধ্বংসের জন্য তা হলে কারবোনিই দায়ী ! কিন্তু আজ কী ধ্বংস করতে চলেছে সে ?

সেটার উত্তর পেয়ে গেলাম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই।

রকেট এসে পড়েছে বিশ্ববিখ্যাত সেন্ট পিটার্স গির্জার উপরে। স্থপতি মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'মাই গড ! ডু সামথিং !' চেঁচিয়ে উঠল সন্ডার্স। ক্রোল জার্মান ভাষায় গাল দিতে শুরু করেছে এই উন্মাদের উদ্দেশে। শেং মুহ্যমান। নকুড়বাবুর অলৌকিক ক্ষমতা আজ স্তব্ধ।

আমি শেষ চেষ্টায় চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম—

'মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোকে সম্মান করতে জানো না তুমি ? তুমি এতই নীচ, এত হীন ?'

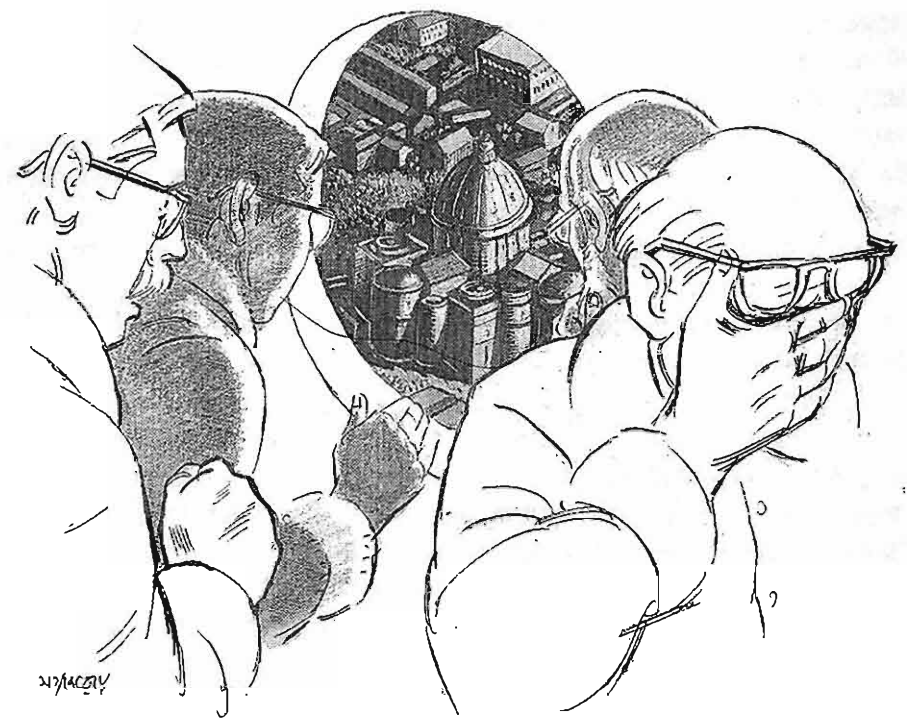

'কোন কীর্তির কথা বলছ তুমি ? বিজ্ঞানের কীর্তি ছাড়া আর কোনও কীর্তিতে বিশ্বাস করি না আমি।'

'কিন্তু তুমি যে বললে মানুষের বন্ধু হিসেবে এসেছিল এই ভিনগ্রহের প্রাণীরা—তবে তাদের রকেটে এমন ভয়ংকর অস্ত্র থাকবে কেন ?'

একটা অট্টহাস্য শোনা গেল পাশের ঘর থেকে।

'এরা কি আর সেই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র লাগিয়েছিল রকেটে ? মহাকাশে অ্যাস্টারয়েডের সামনে পড়লে যাতে সেগুলিকে চূর্ণ করে রকেট পথ করে নিতে পারে তাই এই অস্ত্র। আমি শুধু এটাকে একটু অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছি।'

রকেটের মুখ ঘুরল সেন্ট পিটার্স গির্জার দিকে। রশ্মি আমরা চোখেও দেখতে পেলাম না ; শুধু দেখলাম জ্যোৎস্নাধৌত গির্জা হঠাৎ শতসহস্র খণ্ডে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সেন্ট পিটার্সের চাতালের উপর।

ক্রোল রাগে কাঁপছে, তাই তার কথাগুলো বেরোল একটু অসংলগ্নভাবে।

'তু-তুমি কি জানো যে, এই রকেটকে ঠিক ওইভাবে চূর্ণ করার মতো অস্ত্র আছে মানুষের হাতে ?'

উত্তরে আবার সেই উন্মাদ হাসি।

'সে রকম অস্ত্র এই রকেটে প্রয়োগ করলে কী হবে, তুমি জানো না ? তোমাদের কেন এখানে আসতে দিয়েছি, জানো না ? তোমার সঙ্গের ওই চিন আর ভারতীয় ভদ্রলোকটির কথা জানি না। কিন্তু পৃথিবীর তিনজন সেরা বৈজ্ঞানিক এখানে আছে জানলে কি আর এই

রকেট ধ্বংস করার কোনও প্রশ্ন ওঠে ? তা হলে যে তোমরাও শেষ হয়ে যাবে !'

কারবোনি যে মোক্ষম শয়তানি চাল চেলেছে সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই। ক্রোল সন্ডার্স দু'জনেরই যে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে কারবোনির কথা, সেটা তাদের দেখেই বুঝতে পারছি।

ইতিমধ্যে রকেট তার ধ্বংসের কাজ শেষ করে আবার উপরে উঠতে শুরু করেছে। তার মুখ ঘুরে গেছে উলটো দিকে।

'এবার শঙ্কুকে একটা কথা বলতে চাই', বলল কারবোনি। 'এবারে তোমারই দেশের দিকে যাবে আমার রকেট। ভারতের সবচেয়ে গর্বের বস্তু কোনটি জিজ্ঞেস করলে তোমাদের শতকরা আশি ভাগ লোকই এক উত্তর দেবে। সেটা যে কী, সেটা আশা করি তোমাকে বলে দিতে হবে না। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক সেই জিনিসটি দেখতে আসে তোমাদের দেশে।'

তাজমহল ? কারবোনি কি তাজমহলের কথা বলছে ? সে কি শাজাহানের অতুল কীর্তি ধ্বংস করতে চলেছে ?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। গলা তোলার অভ্যাস আমার নেই, কিন্তু এবারে তুলতেই হল।

'তোমার ধ্বংসের কি শেষ নেই, কারবোনি ? যে পৃথিবীর মাটিতে মানুষ হয়েছ, তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর প্রতি কি তোমার একটুও মমতা নেই ? শিল্পের কি কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে ?'

'শুধু আমার কাছে কেন শঙ্কু ? শিল্পের কোনও মূল্যই নেই। কারুর কাছেই থাকার কথা নয়। মানুষের কোন উপকারে আসে শিল্প ? তাজমহল রইল কি গেল তাতে কার কী এসে যায় ? সেন্ট পিটার্সের কী মূল্য ? পার্থেননের কী মূল্য ? অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকার কী মূল্য ?'

এই অমানুষের সঙ্গে কী তর্ক করব ? অথচ লোকটা না বুঝলেও যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হতে চলেছে, সে তো বুঝতেই পারছি।

'তিলুবাবু—'

নকুড়চন্দ্রের দিকে এতক্ষণ দৃষ্টি দিইনি, কারণ মনের সে অবস্থা ছিল না। এবার চেয়ে দেখি তাঁকে ভারী নিস্তেজ মনে হচ্ছে।

'কী হল ?' জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে।

'ওই ওষুধটা আর এক ডোজ দেবেন কি ?'

'জ্বর জ্বর লাগছে না কি ?'

'না।'

'তবে ?'

'মাথা খেলছে না।'

ওষুধ আমার সঙ্গেই ছিল। দিয়ে দিলাম ভদ্রলোককে আর এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট। কিন্তু এই অবস্থায় ইনি আর কী করতে পারেন ? ভদ্রলোক ঢোক গিলে একটা 'আঃ' শব্দ করে চোখ বুজলেন।

রকেট চলেছে পুবে। দ্বাদশীর চাঁদ এখন ঠিক মাথার উপর। ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ক্রোল ও সন্ডার্স দু'জনেই নির্বাক। চোখের সামনে সেন্ট পিটার্স ধ্বংস হতে দেখে তাদের মনের যে কী অবস্থা হয়েছে সে তো বুঝতেই পারছি। শেং বিড়বিড় করে চলেছে—'পিকিং-এর ইম্পিরিয়াল প্যালেসকে আমরা এতদিন যত্ন করে জিইয়ে রেখেছি।

তার মধ্যে যে চিনের কত শিল্পকীর্তি রয়েছে তার হিসেব নেই। সেটাও যদি যায়...'

আড়াইটে পর্যন্ত মাথা হেঁট করে বসে কেটে গেল। চোখের সামনে নৃশংস ব্যাপার ঘটে চলেছে, অথচ আমরা পাঁচজন পুরুষ শক্তিহীন ; মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছে। এটা যে কত পীড়াদায়ক, সেটা আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

রকেট আবার নামতে শুরু করেছে।

ক্রমে চাঁদের আলোয় ভারতবর্ষের গাছপালা নদী পাহাড় চোখে এল জানলার মধ্যে দিয়ে। জানি, এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হবে—তাও কেন জানি চোখ সরছে না। হয়তো তাজমহলকে শেষ দেখা দেখার ইচ্ছেতেই।

ওদিকের ঘর থেকে গুনগুন করে গানের শব্দ পাচ্ছি। কী অমানুষ ! কী অমানুষ !

এবার গান থেমে গিয়ে কথা এল।

'তাজমহল দেখিনি কখনও, জানো শঙ্কু। শুধু জানি আগ্রার ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিচিউড। ওটুকু জানলেই হল। বাকি কাজ করবে কম্পিউটার। ঠিক জায়গায় এনে ফেলবে রকেটকে। বিজ্ঞানের কী মহিমা, ভেবে দেখো !'

আবার গান।

এবার রকেট দ্রুত নামতে শুরু করেছে। নীচের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আসছে। ক্রোল সন্ডার্স শেং সকলেই জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বুকের ভিতর থেকে একটা আবেগ উঠে এসে গলার কাছটায় জমা হয়েছে। আমি জানি, তাজমহলকে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হতে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারব না। এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুই ভাল ছিল।

ওই যে শহরের আলো ; তবে ইটালির শহরের আলোর মতো অত উজ্জ্বল নয়।

ওই যে যমুনা—চাঁদের আলোয় খাপ খোলা তলোয়ারের মতো চিকচিক করছে।

আর ওই যে তাজমহল। এখনও দূরে, তবে রকেট দ্রুত নেমে যাচ্ছে তার দিকে। শেং এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। সে অস্ফুট স্বরে দুবার বলল—'বিউটিফুল !' সে বইয়েই পড়েছে তাজের কথা, ছবি দেখেছে, সামনে থেকে দেখেনি কখনও।

কিন্তু কী রকম হল ?

পাশের ঘরে গান থেমে গেছে। আমাদের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে।

কোথায় গেল তাজমহল ? এই ছিল, এই নেই—এ কি ভেলকি ?

আর কোথায়ই বা গেল শহরের আলো ?

একমাত্র যমুনাই ঠিক রয়েছে। চাঁদের আলোও আছে, আর সব বদলে গেছে চোখের সামনে। তাজমহলের জায়গায় দেখা যাচ্ছে হাজার কম্পমান অগ্নিশিখা।

রকেট নেমে চলেছে সেই দিকে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—চাঁদের আলোয় আর মশালের আলোয় পিঁপড়ের মতো হাজার হাজার লোক কী যেন করছে, তাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র সাদা পাথরের খণ্ড।

এবার হঠাৎ গোল দরজাটা খুলে গেল, আর দৃষ্টি বিস্ফারিত করে হুমড়ি খেয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকল রোডোল্‌ফো কারবোনি।

'কী হল ! কোথায় গেল তাজমহল ! চোখের সামনে দেখলাম চাঁদের আলোয়, তারপর হঠাৎ কোথায় গেল ?'

আমি আড়চোখে নকুড়চন্দ্রের দিকে দেখলাম। তিনি এখন ধ্যানস্থ। তারপর কারবোনির দিকে ফিরে বললাম, 'তোমার আশ্চর্য রকেট আমাদের এক বিগত যুগে নিয়ে এসেছে, কারবোনি ! তাজমহল থাকবে কোথায় ? তাজমহল তো সবে তৈরি শুরু হয়েছে ! দেখছ না, হাজার হাজার লোক মশালের আলোয় শ্বেতপাথর নিয়ে কাজ করছে ? যে জিনিস নেই,

তাকে ধ্বংস কী করে করবে তুমি কারবোনি ?'

'ননসেন্স !' চেঁচিয়ে উঠল কারবোনি। 'ননসেন্স ! নিশ্চয় আমার রকেটের যন্ত্রপাতিতে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে !'

সে পাগলের মতো আবার গিয়ে ঢুকল কনট্রোল রুমে। দেখলাম, এবার তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হল না।

আমি এগিয়ে গেলাম খোলা দরজাটার দিকে। কারবোনিকে আর বিশ্বাস নেই। সে যে এই অবস্থায় কী করতে কী করে বসবে, তার ঠিক নেই।

আমার পিছন পিছন ক্রোল আর সন্ডার্সও এসে ঘরে ঢুকল।

কারবোনি প্যানেলের বোতামগুলো একটার পর একটা টিপে চলেছে, আর সেই সঙ্গে রকেট অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে টলতে আরম্ভ করেছে।

আমি ক্রোল ও সন্ডার্সের দিকে ইশারা করতেই তারা দুজনে একসঙ্গে কারবোনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'দিক থেকে তার দু' হাত ধরে টেনে তাকে প্যানেল থেকে পিছিয়ে আনল।

আমি প্যানেলটা খুব মন দিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, সাংকেতিক ছবিগুলো চেনা মোটেই কঠিন নয়। আমরাও ওই জাতীয় জ্যামিতিক সংকেত ব্যবহার করে থাকি। একটা বোতামের পাশে ওপর দিকে মুখ করা তীরচিহ্ন দেখে বুঝলাম, ওটা টিপলে রকেট উপরে দিকে উঠবে। সেটা টিপতেই রকেট এক ঝটকায় উপরে উঠতে শুরু করল।

এদিকে কারবোনি রোগা হলে কী হবে, উন্মাদ অবস্থা তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করেছে। ক্রোল ও সন্ডার্সকে এক মোক্ষম ঝটকায় দু'দিকে সরিয়ে দিয়ে সে টাল সামলাতে না পেরে কনট্রোল প্যানেলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার ফলে তার ডান হাতটা গিয়ে পড়ল বিশেষ একটা হলদে সুইচের উপর।

ক্রোল ও সন্ডার্স মেঝে থেকে উঠে আবার এগিয়ে গিয়েছিল কারবোনির দিকে, কিন্তু আমি তাদের ইশারা করে বারণ করলাম।

কারণ হলদে সুইচে হাত পড়ার ফলে রোবট সক্রিয় হয়ে এগিয়ে গেছে কারবোনির দিকে, তার বুকের হলদে আলো জ্বলে ওঠায় সমস্ত ঘর এখন আলোকিত।

রোবটের দুটো হাত একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জাপটে ধরে ফেলল কারবোনিকে। তারপর সেই আলিঙ্গন দেখতে দেখতে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠল যে, কারবোনির অবস্থা ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে লৌহ ভীমের মতো।

আধ মিনিটের মধ্যেই কারবোনির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসা নিষ্প্রাণ দেহ আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে কনট্রোল রুমের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বুঝলাম এই রোবটের শেখা বিদ্যের মধ্যে একটা হল রকেটকে যে বিপন্ন করে—এমন প্রাণীর সংহারসাধন।

কারবোনিকে ছেড়ে রোবট এখন গেছে কনট্রোল প্যানেলের দিকে। তার স্বচ্ছ আঙুলগুলো এখন সে স্বচ্ছন্দে চালনা করছে বোতামগুলোর ওপর। রকেটের দোলানি থেমে গেছে, আমি নিজে সরে এসেছি প্যানেলের সামনে থেকে। জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখে বুঝলাম, রকেট এখন উড়ে চলেছে তুষারাবৃত হিমালয়ের উত্তর দিকে।

আমরা তিনজনেই আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো মেঝে থেকে তুলে নিয়ে গোল ঘরে ফিরে এলাম। নকুড়চন্দ্র এখন প্রসন্নভাবে ও সুস্থ শরীরে টুলের উপর বসা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেয়েছিলে তাজমহল তৈরির বর্ণনা ? তাভেরনিয়েরের বইয়ে কি ?'

'ঠিক বলেছেন স্যার। ঘোষাল সাহেবের বাড়িতে ছিল ওই ফরাসি সাহেবের লেখা দু' ভল্যুম বই।'

দু' ঘণ্টার মধ্যে আমরা হিমালয় অতিক্রম করে সিংকিয়াং-এ এসে পড়লাম।

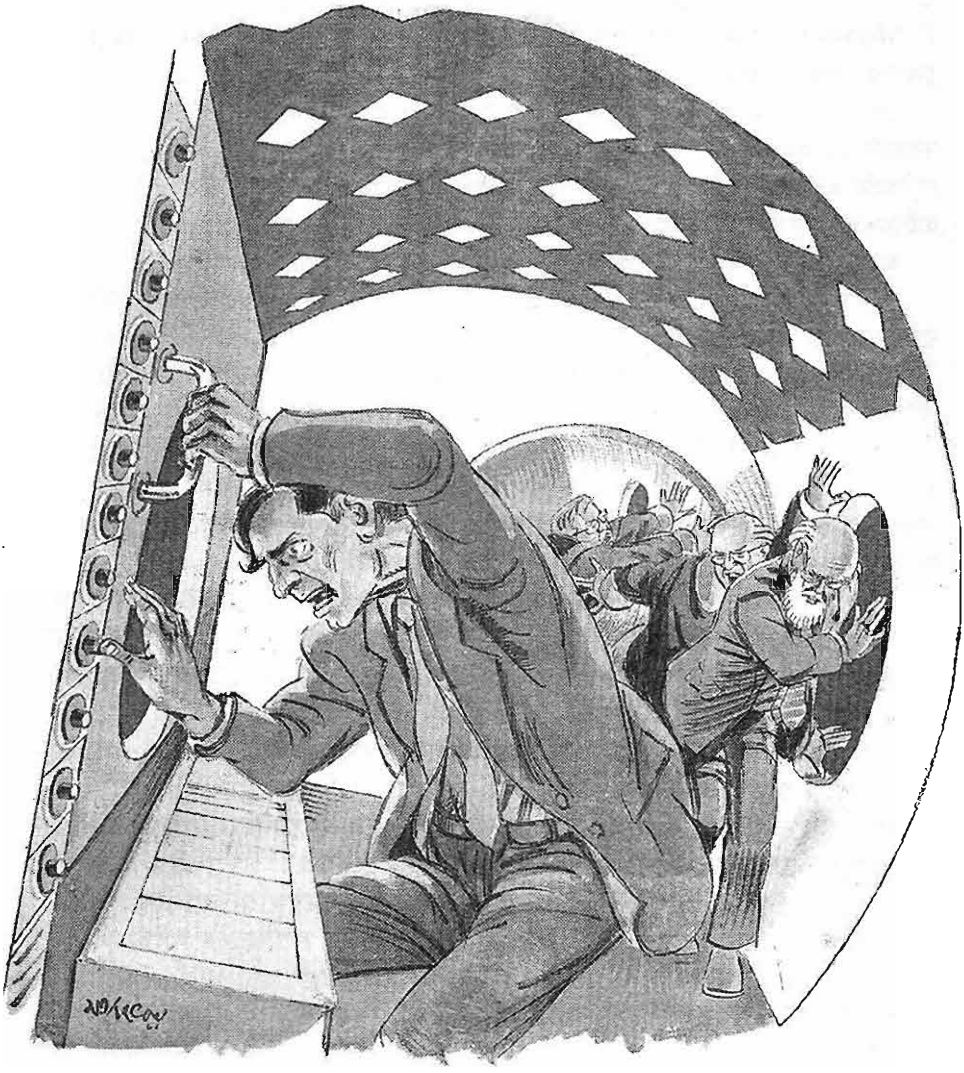

তারপর ঠিক ভোর পাঁচটায় তাকলা-মাকানের উত্তর প্রান্তে যেখান থেকে উড়েছিল রকেট, ঠিক সেখানেই এসে নামল। নিঁখুতভাবে রকেট চালনার কাজ শেষ করে রোবট কনট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের গোল ঘরে। ততক্ষণে সামনের দরজা খুলে গিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। রোবট দরজা থেকে কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সেই দিকে। অর্থাৎ—তোমরা এবার এসো।

আমরা পাঁচজনে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরের ভোরের শীতে।

ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলাম সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়ে রকেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পুবের আকাশে তখন গোলাপির আভা দেখা দিয়েছে। রকেটের বাইরে থেকেও সেই দপ দপ শব্দটা কেন শুনতে পাচ্ছি, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এবার সেই শব্দটা হঠাৎ বেড়ে গেল।

'চলে আসুন ! চলে আসুন ! রকেট উড়বে !'

নকুড়চন্দ্রের সতর্কবাণী শুনে আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে পাথরের ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিলাম, আর সেখান থেকেই দেখলাম, রকেট তার নীচের মাটি তোলপাড় করে দিয়ে ধুলো বালিতে সবেমাত্র ওঠা সূর্যকে ঢেকে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে উপর দিকে উঠে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা ঢিবির পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম যেখানে রকেট ছিল, সেই দিকে। একটা জিনিস দেখে মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, শেং-এর উল্লাসে সেটা বিশ্বাসে পরিণত হল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, ইউ.এফ.ও.-র দাপটে তাকলা-মাকানের মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই গর্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাথরের গায়ে কারুকাজ করা এক সুপ্রাচীন সৌধের উপরের অংশ।

এটাই যে অষ্টম শতাব্দীর সেই বৌদ্ধ বিহার, সে সম্বন্ধে শেং-এরও মনে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নেই।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৯

আশ্চর্জন্তু

আগস্ট ৭

আজ এক আশ্চর্য দিন।

সকালে প্রহ্লাদ যখন বাজার থেকে ফিরল, তখন দেখি ওর হাতে একটার জায়গায় দুটো থলি। জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'দাঁড়ান বাবু, আগে বাজারের থলিটা রেখে আসি। আপনার জন্য একটা জিনিস আছে, দেখে চমক লাগবে।'

আমার তেত্রিশ বছরের পুরনো প্রৌঢ় চাকর আমাকে চমক দেবার মতো কিছু আনতে পারে ভেবে আমার হাসি পেল। কী এনেছে সে থলিতে করে?

মিনিটখানেকের মধ্যে প্রশ্নের জবাব পেলাম, আর চমক যেটা লাগল সেটা যেমন তেমন নয়, এবং তার মাত্রা অনুমান করা প্রহ্লাদের কর্ম নয়।

থলি থেকে বার করে যে জিনিসটা প্রহ্লাদ আমার হাতে তুলে দিল সেটা একটা জানোয়ার। সাইজে বেড়ালছানার মতো। চেহারার বর্ণনা আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাণিবিদ্যাবিশারদদের মতে পৃথিবীতে আন্দাজ দু'লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার আছে। আমি তার বেশ কিছু চোখে দেখেছি, কিছুর ছবি দেখেছি, আর বাকি অধিকাংশেরই বর্ণনা পড়ে জেনেছি তাদের জাত ও চেহারা কীরকম। প্রহ্লাদ আমাকে যে জন্তুটা দিল সেরকম জন্তুর বর্ণনা আমি কখনও পড়িনি। মুখ দেখে বানর শ্রেণীর জানোয়ার বলেই মনে হয়। নাকটা সাধারণ বাঁদরের চেয়ে লম্বা, কপাল বাঁদরের তুলনায় চওড়া, মাথাটা বড় আর মুখের নীচের দিকটা সরু। কান দুটো বেশ বড়, চাপা, এবং উপর দিকটা শেয়াল